Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিকুন্নাহার

রোলঃ 228020526

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কারবালার ইতিহাস

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবিকুন্নাহার

রোলঃ 228020526

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কারবালার ইতিহাস " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবিকুন্নাহার, আইডিঃ 228020526 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কারবালার ইতিহাস " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সাবিকুন্নাহার

আইডিঃ 228020526

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও খিলাফাতের সূচনা :..6

খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কাল :..7

আলী ইবন আবি তালিব (রা.) এর খিলাফত 8

মুসলিমদের মাঝে সিফফিনের যুদ্ধ...9

খারিজিদের আত্মপ্রকাশ ও আলি রাযি.-এর ইন্তেকাল...11

হাসান রা. এর খিলাফত..13

নবী (স) এর ভবিষ্যতবাণী ও মুয়াবিয়া রাযি এর কাছে বায়ত......................................14

হাসান রা.-এর মৃত্যু..15

মুয়াবিয়া রাযি. এর পরিচয় 16

হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর গুণাবলী : 17

হজরত মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফত ও দায়িত্ব : 19

পরবর্তী খলিফারূপে ইয়াজিদকে নির্বাচন 24

ইযাজিদের মনোনয়ন কি অন্যান্য খলিফা নির্বাচনের নিয়মে ছিলো ?............................24

রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের সূচনা 25

ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের কারণ কি ছিলো..26

খিলাফত শেষের আগেই কেন ইয়াজিদকে খলিফা নির্বাচিত করা হয় 27

ইয়াজিদের যোগ্যতা...28

ইয়াজিদের প্রতি মুআবিয়া রা.-এর অসিয়ত 29

মুআবিয়া রা.-এর শেষ দিনগুলি 30

ইয়াযিদের প্রথম খুৎবা ও বায়াতের জন্য বার্তা প্রেরণ :...32

হযরত হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হননি কেন?...33

হযরত হুসাইন রাঃ কি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন? 33

ইয়াযিদের রাজনৈতিক প্রথম ভুল 34
আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রা: কেন মদীনা থেকে মক্কা রওনা দেন 35
ওলীদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ 36
কেন নেতৃস্থানীয় ও মুরুব্বীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হোন 37
আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াযিদের পত্র 38
হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার শিয়াদের পত্র 39
কুফাতে মুসলিম বিন আকীল 42
হযরত হোসাইন রা. এর কাছে আশ্বাসমূলক পত্র প্রেরণ 43
হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফা যেতে কে কিভাবে বাধা দিয়েছিলো 43
হযরত হুসাইন রাঃ এতো বাঁধার পরও কেন থামলেন না? 45
নুমান বিন বশীরকে বরখাস্ত 46
প্রতারণা ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা 47
উবাইদুল্লাহর কাছে হুসাইন রাঃ এর রওনার সংবাদ 48
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র 48
মুসলিম বিন আকিলের অবস্থা না জানাতে কি করা হয়েছিলো 49
মুসলিম বিন আকীলের হত্যার সংবাদ 50
হোসাইন রা. মুসলিম বিন আকীলের খবর পেয়েও ফিরতে পারেনি কেন 50
হুর বিন ইয়াযিদের পরামর্শ ও হোসাইন রা. এর দামেশে যাত্রা 51
দামেশের পথে বাধা : 52
উমর বিন সা'দের কারবালা রওনা 54
কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের শুরু : 54
হুসাইন রাঃ কে অপমান ও পরিণতি 56
আব্দুল্লাহ এর শাহাদত 57
শিয়া কুফীদের গাদ্দারী 57

হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত 58

কারবালার শহীদ : 60

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর : 60

কারবালার শিক্ষা : 63

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সুবহানা তা'আলার জন্য যিনি সর্বশক্তিমান ,ক্ষমাশীল ,পরম দয়ালু ।আর সালাম ও দরুদ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জন্য।

নবী (স) এর ওফাতের পর সকলের সম্মতিতে হযরত আবু বরক (র) এর উপর খিলাফতের দায়িত্ব আসে। তারপর এই ধারা চলতে থাকে। আর   হযরত ওসমানের (রা) শাহাদত থেকেই মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ফিত্না শুরু হয়। এতে মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র এবং সরলমনা মুসলমানদের আবেগ সম্বলিত অনেক ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। নবীগণের পরে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বস্বীকৃত, সেই মুসলমানগণ নিজেরাই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

ইসলামী খেলাফতের পরম্পরা যখন আমির মুয়াবিয়া (রা) পর্যন্ত এসে পৌছে, তখন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে 'খেলাফতে রাশেদার' সেই রূপ অনুপস্থিত থাকে, যে রূপ নিয়ে অন্যান্য খলিফা রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন।

হযরত মুয়াবিয়াকে (রা) পরামর্শ দেয়া হলো যে, এ যুগটি ভীষণ ফিত্নার যুগ। আপনি আপনার পরবর্তী সময়ের জন্য এমন এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে যান, যাতে আপনার পরে আবার মুসলমানগণ পরস্পরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে না পড়ে এবং ইসলামী খেলাফত (রাজত্ব) খন্ড-বিখন্ড না হয়ে যায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে সে সময় এ প্রস্তাবটি অযৌক্তিক ও অমূলক ছিল না। কিন্তু এই পরামর্শ দাতাগণ, সাথে সাথে পরবর্তী খলীফা হিসেবে মুয়াবিয়ার (রা) পুত্র ইয়াযীদের নাম তাঁর কাছে পেশ করলেন। কুফা থেকে চল্লিশ জন মুসলমান মুয়াবিয়ার (রা) কাছে এসে আবেদন করলেন যে, আপনার পরে এই ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য খলীফা হিসেবে আপনার পুত্র ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তি অন্য আর কাউকে দেখছি না। তার খেলাফতের ওপর আপনি বাইয়াত গ্রহণ করুন। হযরত মুয়াবিয়া (রা) প্রথমে এ প্রস্তাবটির ব্যাপারে খুব চিন্তা-ভাবনা করলেন। তিনি তাঁর একান্ত ব্যক্তিদের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শে বসলেন। এই পরামর্শ বৈঠকে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ এ প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন। কেউ এর বিরোধিতা করলেন। ইয়াযীদের অন্যায় আচরণগুলো তখন পর্যন্ত সবার কাছে অপ্রকাশিত ছিল। অবশেষে বৈঠকে ইয়াযীদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

ইসলামী খেলাফত হচ্ছে খেলাফতে নবুওয়াত। এই খেলাফতে উত্তরাধিকারীদের কোনই অধিকার নেই যে, পিতার পরে তাঁর পুত্র খলীফা হবে। বরং এখানে যেটা অতি প্রয়োজন, তা হচ্ছে স্বাধীন ও নিরেপেক্ষ ভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে খলীফা মনোয়ন করা। দ্বিতীয়ত তাঁদের

মতে, ইয়াযীদের ব্যক্তিগত চরিত্রের কারণে তাকে গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফারূপে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এ কারণে, উল্লিখিত সাহাবাগণ (রা) এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। আর অধিকাংশ সাহাবাগণ (রা) তাঁদের ওফাত পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তের ওপর অটল ছিলেন। তাঁদের এই সত্য কথা বলা এবং ন্যায়ের সহায়তা করার কারণেই মক্কা, মদীনা এবং কুফা ও কারবালার রক্তক্ষয়ী ঘটনা সংঘটিত হয়। যা মুসলিমদের ইতিহাসে খুবই বেদনাদায়ক অধ্যায় ছিলো।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরা অনেকেই সেই সত্য থেকে দূরে আছি।" বিষাদ সিন্দুর" ন্যায় অনেক বই বের হয়োছে যা আসল সত্যকে ডেকে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার বিদআতি কাজ, কারবালাকে কেন্দ্র।করে নিজেদের রক্তাক্তসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছে। যা ইসলাম বিরোধি। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদের জরুরি হলো কারবালা আসল ইতিহাস জানা।

ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ ও খিলাফাতের সূচনা :

কারবালার ইতিহাসের আগে আমাদের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে । তাই মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে হাদীস এ কি আসছে সে সম্পর্কে জানা খুবই জরুরী ।

হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُون ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ الله ُأَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيّاً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ

-তোমাদের মধ্যে নুবুওয়াত থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন, এরপর যখন আল্লাহ চাইবেন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর হবে নুবুওয়াতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাত। যতদিন আল্লাহ চাইবেন থাকবে, যখন আল্লাহ চাইবেন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর হবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা রাজতন্ত্র। যতদিন আল্লাহ চাইবেন থাকবে, যখন আল্লাহ চাইবেন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর হবে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া রাজতন্ত্র। যতদিন আল্লাহ চাইবেন থাকবে, যখন আল্লাহ চাইবেন তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর (পুনরায়) আসবে নুবুওয়াতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাত। (মুসনাদে আহমাদ, ১৮৪০৬)

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে উম্মতের ইতিহাসকে ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। (১) নুবুওয়াত তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যুগ। (২) খিলাফাত তথা খুলাফায়ে রাশিদীনের

যুগ। (৩) দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা রাজতন্ত্র। যেমন- উমাইয়া, আব্বাসী, উসমানী (অটোমান) প্রমুখ। যেখানে শাসকরা মুসলিম ছিলেন সত্য, কিন্তু শাসনব্যবস্থা পুরোপুরি সুন্নাতের ওপর কায়িম ছিল না। (৪) জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া রাজতন্ত্র। যেমন মুসলিম উম্মাহ'র ওপর ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ, ইটালিয়, ডাচ বা পর্তুগিজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন। (৫) পুনরায় নুবুওয়াতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফাত, তথা কিয়ামাতের পূর্বে ইমাম মাহদী ও সায়্যিদুনা মাসীহ আলাইহিস সালামের যুগ। ১১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের মাধ্যমে নুবুওয়াত শেষ হয় এবং খিলাফাতের সূচনা হয়।

খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কাল :

নবী মুহাম্মদ (স) এর পরে শুরু হই খুলাফায়ে রাশিদীনের সময়কাল। প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (১১-১৩ হি.)। এরপর উমর (রা.) (১৩-২৩ হি.) উসমান (রা.) (২৩-৩৫ হি.) এবং আলী (রা.) (৩৫-৪০ হি.)। আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর হাসান ইবন আলী (রা.) (৪০-৪১ হি.) আরও ৬ মাস দায়িত্ব পালন করেন । আর প্রথম ফিতনার শুরু হয় উসমান (রা.) এর শাসন আমলে।

সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

-আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফাত থাকবে ৩০ বছর। এরপর হবে রাজতন্ত্র। (সুনান আত-তিরমিযী, ২২২৬)

খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফাতকাল ছিল ৩০ বছর। তন্মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (১১-১৩ হি.) উমর (রা.) (১৩-২৩ হি.) উসমান (রা.) (২৩-৩৫ হি.) এবং আলী (রা.) (৩৫-৪০ হি.)। আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর হাসান ইবন আলী (রা.) (৪০-৪১ হি.) আরও ৬ মাস দায়িত্ব পালন করার পর খিলাফাতে রাশিদার ৩০ বছর সমাপ্ত হয়। এরপর শুরু হয় রাজতন্ত্র। প্রশ্ন জাগে, নববী আদর্শ ও খিলাফাতে রাশিদার পথপরিক্রমা ত্যাগ করে এ উম্মত কীভাবে রাজতন্ত্রের ঘেরাটোপে পতিত হলো?

৩য় খলীফা উসমান (রা.) এর খিলাফাতকালে কতিপয় প্রাদেশিক গভর্নরের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছিল। তন্মধ্যে কুফার গভর্নর ওয়ালিদ ইবন উকবা ও মিশরের গভর্নর আবদুল্লাহ ইবন সা'দ ইবন আবিস সারাহ উল্লেখযোগ্য। খলীফা নিজ গোত্র বনু উমাইয়ার

লোকজনকে বিশ্বাস করে যেসব দায়িত্ব দিয়েছিলেন, দু'একজন ছাড়া বাকিরা সে বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে পারেনি। কতিপয় সাহাবী খলীফার কিছু সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। খলীফা চেষ্টা করেছিলেন বিষয়গুলোকে সমাধান করতে। কিন্তু কিছু বিপথগামী লোক এসব অভিযোগ সামনে এনে খলীফার বিরুদ্ধে প্রচারণা করতে শুরু করে। ইরাক ও মিশরের কয়েকশ লোক মদীনায় এসে খলীফার বাসভবন ঘেরাও করে (সুনান আত-তিরিমিযী, ৩৭০৩) এবং খলীফার পদত্যাগ দাবি করে। খলীফা তাতে অস্বীকৃতি জানান। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমনটি করতে বারণ করেছিলেন।

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللهَ يُقَمِّصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلاَ تَخْلَعْهُ لَهُمْ

-হে উসমান, আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরাবেন। যদি তারা এটি খুলে নিতে চায়, তাহলে তুমি তাদের জন্য সেটি খুলে দেবে না। (সুনান আত-তিরমিযী, ৩৭০৫)

সাহাবীরা এসব বিপথগামীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করলেও খলীফা নিজের সুরক্ষায় মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ঘটানোর অনুমতি দেননি। এক সময় বিদ্রোহীরা খলীফার ঘরে প্রবেশ করে এবং নির্মমভাবে তাঁকে হত্যা করে (বিদায়াহ, ৭ম খন্ড)। উসমান (রা.) এর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে উম্মতের ঐক্য চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়।

আলী ইবন আবি তালিব (রা.) এর খিলাফত

উসমান (রা.) এর শাহাদাতের পর চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে আলী ইবন আবি তালিব (রা.) উম্মাহ'র নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

সবার মধ্যে তখন উসমান (রা.) এর নির্মম শাহাদাত নিয়ে প্রচন্ড ক্ষোভ ছিল। আলী (রা.) চেয়েছিলেন প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা স্তিমিত করে উসমান হত্যার বিচার করবেন। কিন্তু উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা.) এ ব্যাপারে খলীফাকে চাপ দিতে থাকেন। তাঁর সাথে যুক্ত হন প্রসিদ্ধ সাহাবী তালহা (রা.) এবং যুবাইর (রা.)। তাঁরা মদীনা ছেড়ে বসরায় চলে যান এবং উসমান হত্যার বিচার দাবি করেন। (সহীহ বুখারী, ৭১০০)

ওদিকে সিরিয়ার গভর্নর মুআবিয়া (রা.) আলী (রা.) এর হাতে বাইআত দেননি। তার ওপর তিনি উসমান হত্যার বিষয়টি নিয়ে চরম উদ্বেগপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন। আলী (রা.) বিষয়টি সমাধা করার জন্য সিরিয়ায় রওয়ানা করেছিলেন। পথিমধ্যে আয়িশা (রা.) এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সাথে আলী (রা.) এর বাহিনীর সাক্ষাৎ ঘটে। দু'দল আলোচনার মাধ্যমে উসমান হত্যার বিচারের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছালেও কতিপয় মুনাফিকের ষড়যন্ত্রে জনতার মধ্যে যুদ্ধ

বেধে যায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কয়েক হাজার মুসলমান প্রাণ হারান। তালহা (রা.) এবং যুবাইর (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করার পর আলী (রা.) আয়িশা (রা.) কে সসম্মানে বসরায় পাঠিয়ে দেন। এ যুদ্ধের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (মুসনাদে আহমাদ, ২৪২৯৯)। না চাইতেও এমন একটি বিপর্যয় আসবে, কেউ ভাবতেই পারেনি। আয়িশা (রা.) উষ্ট্রীর যুদ্ধে
তাঁর পদক্ষেপের জন্য আমৃত্যু আফসোস করেছেন। (মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবা, ৩৭৭৭২)

মুসলিমদের মাঝে সিফফিনের যুদ্ধ

এক যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই আরেকটি বড় যু)।দ্ধাবস্থা তৈরি হল। হযরত আমীরে মুআবিয়া রা. তখন শামের গভর্ণর। তিনি যখন দেখতে পান যে, একদিকে উসমান-হত্যার বিচারের কার্যকর কোন পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না, অপরদিকে বিচারের দাবিদার আন্দোলনকারীগণ বসরায় সমবেত হওয়ার পর উটের যুদ্ধের ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন তিনি বায়আতের বিষয়ে আরও বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন।

অপরদিকে আলি রাযি.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- যেহেতু তিনি এখন ইসলামি রাষ্ট্রের বৈধ খলিফা এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসন ও জনগণ ইতিমধ্যে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছে, তাই ইসলামি খিলাফতের অধীনস্থ একটি অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কর্তব্য তার বায়আত গ্রহণ করা।

অবশেষে ৩৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে খলিফা আলি রাযি. শামের গভর্নর-পদ হতে মুয়াবিয়া রাযি.-কে অপসারণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি. খলিফার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। বাধ্য হয়ে খলিফা আলি রাখি, তার বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে মুয়াবিয়া রাযি.-এর মোকাবিলায় রওনা হন। মুয়াবিয়া রাযি.-ও নিজ বাহিনী নিয়ে শাম থেকে বের হয়ে আসেন। ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দলও তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

যুদ্ধের পূর্বে আলি রাযি. নিজ অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাখি, তা মেনে না নেওয়ায় সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সিফফিনের কাছে উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর হাতে নিহত হন। নবীজি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.-কে বলেছিলেন
تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।

ফলে এতদিন যারা শামি বাহিনির সাথে যুদ্ধে শরিক হতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করে চলছিলেন, তার শাহাদাতের পর তাদেরও আর সংশয় থাকল না। এমনিতেই ইরাকি বাহিনীর আক্রমণ অভাবনীয় প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছিল। তখন পর্যন্ত খুযাইমা ইবনু সাবিত রা. তরবারি কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন। রাসুলের উপর্যুক্ত ভবিষ্যদ্বাণী তিনি শুনেছিলেন।

তিনি বলছিলেন, 'আম্মার শহিদ হওয়ার আগপর্যন্ত আমি তরবারি কোষমুক্ত করবো না। আম্মার রা. শহিদ হওয়ার সাথে সাতে তিনি তরবারি উন্মুক্ত করেন এবং লড়াই করতে করতে শহিদ হয়ে যান।

আম্মার ইবনু ইয়াসির রা.-এর শাহাদাত মুআবিয়া-বাহিনীর সামনে এক কঠিন প্রশ্ন দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সে সময় শামি বাহিনীর দল ত্যাগ করে আলি রা.-এর বাহিনীতে যোগ দেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জুবাইদ ইবনু আবদ খাওলানি রহ. এবং উমার রা.-এর আজাদকৃত গোলাম হুনাই রহ.।

আমর ইবনু হাযম রা. তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ আমর ইবনুল আস রা.-কে দেন। তিনি ঘাবড়ে যান। মুআবিয়া রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে আম্মার রা.-এর শাহাদাতের সংবাদ দেন এবং 'বিদ্রোহী বাহিনী'র হাদিসটি স্মরণ করিয়ে দেন। হাদিসটি প্রমাণ করছিল, আলি রা. আপন ইজতিহাদে হকের পক্ষে আছেন এবং মুআবিয়া রা.ভুলের মধ্যে আছেন। কিন্তু মুআবিয়া রা.-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'বিদ্রোহী বাহিনী' দ্বারা উদ্দেশ্য আমরা নই। আমরা তো উসমান রা. এর কিসাস গ্রহণের জন্য লড়াই করে যাচ্ছি। হয়তো তার সামনে রাসুলের ওই হাদিসটি ছিল যেখানে তিনি উসমান রা: সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তার পায়ের নিচে (অর্থার হার তিরোধানের পর) এক ফিতনার উদ্ভব হবে। সেসময় যারা তার অনুসারী হবে তারাই হকের পক্ষে থাকবে।

সুতরাং মূল মর্মকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি আমর ইবনুল আস রা.-কে বলেন:

أَو نَحْنُ قَتَلْنَاهُ ؟ إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ ، جَاؤُوا بِهِ حَتَّى الْقَوْهُ بَيْنَ رِمَاحِنَا

'তাকে কি আমরা হত্যা করেছি? তাকে তো হত্যা করেছে আলি রা. ও তার সাথিরা। তারা তাকে নিয়ে এসেছে এবং আমাদের বর্শার সম্মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এটা তো সুস্পষ্ট যে, মুআবিয়া রা.-এর এই ব্যাখ্যা বাস্তবে সঠিক নয়; কিন্তু এই ঘটনায় আম্মার রা.-এর শাহাদাতে আমর ইবনুল আস রা. ও মুআবিয়া রা.-এর চরম অস্থিরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য, একবার আম্মার রা. কঠিন অসুস্থতার সময়ে বলেছিলেন, 'আমি এই অসুখে মরবো না: প্রিয় রাসুল আমাকে বলে গিয়েছেন, 'দুটি মুমিন দলের মাঝখানে আমাকে হত্যা করা হবে।

এভাবে আমার মৃত্যু হবে।' বোঝা যায়, সিফফিনে যুদ্ধরত দুটি দলই ছিল ঈমানদার ও ন্যায়নিষ্ঠাবান।

سئل على عن قتلى يوم صفين - فقال قتلانا وقتلاهم في الجنة، وتصير الأمر إلى وإلى معاوية (٣٧٨٨) مصنف ابي شيبة ح

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এর যুদ্ধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন তাদের নিহত ব্যক্তিরা ও আমাদের নিহত ব্যক্তিরা জান্নাতি। বিষয়টি আমার ও মুয়াবিয়ার উপর নির্ভর করবে।

একপর্যায়ে জয়ের পাল্লা আলি রাযি.-এর দিকে হেলে পড়ে এবং মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এ সময় মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীতে থাকা আমর ইবনুল আস রাযি. যুদ্ধ বন্ধ করে সালিশ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন। তখন মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর সৈন্যরা কুরআন উঁচু করে ধরে এবং মধ্যস্থতার দাবি জানায়। অতপর আমর ইবনুল আস রাযি., ও আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে মধ্যস্থতাকারী নির্ণয় করা হয়। উভয়ে সিদ্ধান্ত জানান- আলি রাযি.-এর খিলাফতের দায়িত্ব থাকবে। এবং আলি রাখি, তার অধীনস্থ অঞ্চলের দেখাশোনা করবেন আর শামের দায়িত্ব থাকবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে।

খারিজিদের আত্মপ্রকাশ ও আলি রাযি.-এর ইন্তেকাল

আলি রাযি.-এরআলি রাযি.-এর বাহিনীর বারো হাজার সৈন্যের একটি দল মধ্যস্থতার মূল প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ ইতিপূর্বে তারাই আলি রাযি.-কে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ক্ষান্ত না হয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় হজরত আলিকে কাফির সাব্যস্ত করে।

বিচ্ছিন্ন বাহিনী কুফায় পৌছে হারুরা নামক গ্রামে অবতরণ করে। এ কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী এ দলটিকে হারুরিয়া নামে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের প্রসিদ্ধ নাম হলো খারিজি সম্প্রদায়।

৪০ হিজরিতে খারিজিরা আমিরুল মুমিনিন আলি রাযি., শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. ও (তাদের দৃষ্টিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অপরাধী) আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উল্লিখিত তিন মহান সাহাবিকে হত্যা করার জন্য তিনজন গুপ্তঘাতককে দায়িত্ব দেয়। আলি রাযি.-কে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে, মুয়াবিয়া রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বুরাক বিন

আবদুল্লাহকে আর আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমর বিন বকর তামিমিকে।

সিদ্ধান্ত হয়, তিন গুপ্তঘাতক ১৭ রমজান ফজর নামাজের সময় তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু তিন গুপ্তঘাতকের মধ্যে কেবল একজনই তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

৪০ হিজরি সনের ১৭ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি)। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো খলিফা আলি রাযি. ফজরের পূর্বে সকলকে জাগ্রত করতে ঘর থেকে বের হন। কুফার মসজিদের দরজায় ওত পেতে ছিল খারিজি গুপ্তঘাতক। আলি রাযি. মসজিদের কাছে পৌঁছতেই গুপ্তঘাতক তার ওপর হামলা চালায়। আহত খলিফা চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'কাবার রবের শপথ! আমি তাতে সফলকাম!'

লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ঘাতককে ধরে ফেলে। খলিফার তখন অন্তিম মুহূর্ত সন্নিকটে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ঘাতককে কী করা হবে? অলি রাযি. উত্তর দেন, যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে করণীয় আমিই নির্ধারণ করব। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে করণীয় নির্ণয়ের অধিকার তোমাদের। তোমরা যদি কিসাস গ্রহণেরই সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে এক আঘাতের পরিবর্তে এক আঘাতই করবে; আর যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা-ই তাকওয়ার নিকটতর দাবি।

একই সময় শামে বুরাক বিন আবদুল্লাহ মুয়াবিয়া রাযি.-এর ওপর আক্রমণ চালায়। তার লক্ষ্যভ্রষ্ট আঘাতে মুয়াবিয়া রাযি. আহত হলেও পরে সুস্থ হয়ে যান। অপরদিকে আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করার জন্য ঘাতক আমর বিন বকর ওত পেতে থাকলেও তিনি সেদিন অসুস্থতার কারণে নিজে মসজিদে না গিয়ে খারিজা বিন হুযাফা রাযি.-কে ইমামতি করার জন্য পাঠান। ঘাতক তাকেই আমর মনে করে হত্যা করে।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি. তেষট্টি বছর বয়সে ৪০ হিজরির ২১ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) কুফায় ইন্তেকাল করেন।

হাসান রা. এর খিলাফত

৪০ হিজরির শাওয়াল মাসে (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মদিনাবাসী হজরত হাসান বিন আলি রাযি.-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে।হাসান ইবন আলি রা.-এর খিলাফাত

আলি রা. এর শাহাদাতের পর মুসলিম-বিশ্বে পুত্র হাসান রা. থেকে অধিক মর্যাদাশীল ও উন্নত বংশীয় আর কেউ ছিল না। হাসান রা. এর।সাথে রাসুলুল্লাহ সা.-এর এমন ভালোবাসা ছিল যে, কয়েকবার তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ, আমি হাসানকে ভালোবাসি; আপনিও তাকে ভালোবাসেন। যে হাসানকে ভালোবাসে তাকেও আপনি ভালোবাসেন। সাহাবিগণ বলতেন, রাসুলে আকরামের সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল হাসান।

:

এছাড়াও নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছিলেন :
'আমার এই নাতি একদিন নেতা হবে। আশা করি, আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে উম্মতের দুটি বিরাট দলের মধ্যে সন্ধি করে দেবেন।

তাই অতি দ্রুত তারা হাসান রা.-এর হাতে বাইআতগ্রহণে একমত হয়ে যান। তাদের অনুরোধের মুখে হাসান রা. প্রথমে চুপ থাকলেও পরবর্তী উম্মাহর কল্যাণচিন্তা থেকে তিনি বাইআত নেওয়া শুরু করেন। সর্বপ্রথম বাইআত হন কায়িস ইবনু সাদ ইবনি উবাদা রা.। তিনি ছিলেন কুফা বাহিনীর সেনাপতি।

খিলাফাতের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়ার পর প্রথম যে খুতবা তিনি দিয়েছিলেন তার একটি শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, উম্মাহর কল্যাণ ও নেতৃত্বের জন্য রক্তপাত করার ব্যাপারে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট ছিলেন।

তিনি এমন আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন-মুসলিমদের ইতিহাস যা নিয়ে গর্ব করবে। তিনি ছিলেন রাসুলের বংশধর। ছিলেন খিলাফাতের সর্বোচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। ইরাকি বাহিনী তার ইশারায় মৃত্যুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে তৈরি ছিল। তার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। এতসব থাকার পরও তিনি আনুগত্য কবুল করেছেন। তার জায়গাতে পৃথিবীর যেকোনো শাসক হতো, নেতৃত্বের জন্য জীবন দিয়ে দিত; কিন্তু তিনি তো কোনো বাদশা ছিলেন না; ছিলেন খুলাফায়ে রাশিদিনের পরিশিষ্ট। নেতৃত্ব, স্বার্থপরতা, ব্যক্তিগত কল্যাণচিন্তা, কামনা-বাসনা থেকে যারা ছিলেন পূত-পবিত্র, হাসান রা. ছিলেন তাদেরই প্রতিচ্ছবি। যে অনুপম

আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন-তা কেবল একজন প্রকৃত খলিফায়ে রাশিদের পক্ষে সম্ভব।

নবী (স) এর ভবিষ্যতবাণী ও মুয়াবিয়া রাযি এর কাছে বায়ত

আলি রা.-এর শাহাদাতের পর মুআবিয়া রা. ইলিয়া অঞ্চলে (বাইতুল মাকদিস) শামবাসীর থেকে খিলাফাতের বাইআতগ্রহণ শুরু করেছিলেন এবং তাকে আমিরুল মুমিনিন বলা শুরু হয়েছিল।

এটা ছিল মুসলিম-বিশ্বের রাজনীতিতে একটি নবতর পরিবর্তন। কেননা, আলি রা.-এর জীবদ্দশায় মুআবিয়া রা. খিলাফাতের দাবি করেন নি। তখন তাকে কেবল 'আমির' বলা হতো।

খিলাফাতের দুজন দাবিদার থাকা অবস্থায় ঐক্য পুনরুজ্জীবিত করা জরুরি। তাই এমন স্পর্শকাতর মুহূর্তে তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন! এমন পরিস্থিতিতে হাসান রা. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি নিজের নেতৃত্ব বিসর্জন দিতে পিছপা হবেন না। এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো ভীরুতা বা দুর্বলতা ছিল না। বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে পরিপূর্ণ শক্তি ও স্বাধীনতা হাতে থাকার পরও তিনি এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন। যারা প্রমাণ করে যে, আপন সেনাদের দুর্বলতা ও অবাধ্যতায় বিরক্ত হয়ে তিনি মুআবিয়া রা.-এর সাথে সন্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেগুলো দুর্বল রাবি থেকে বর্ণিত। হ্যাঁ, তার বাহিনীতে এমন কিছু লোক ছিল-যারা শামিদের সাথে সন্ধি করা পছন্দ করে নি; কিন্তু তারা এক্ষেত্রে প্রভাবও বিস্তার করতে পারে নি। প্রভাবশালী দলটি ছিল হাসান রা.-এর এক বিশ্বস্ত। তাদের সংখ্যা ছিল লাখ-লাখ। হাসান রা. শুরুতেই নিজের এজেন্ডা প্রকাশ করেন নি; যাতে কোনো বিরোধীকণ্ঠ উচ্চকিত না হয়; বরং বাইআত গ্রহণের সময় তিনি শর্তারোপ করেছেন, 'তোমরা আমার কথা শুনবে এবং মানবে। আমি যার সাথে সন্ধি করবো তোমরাও তার সাথে সন্ধি করবে। যার বিরুদ্ধে লড়াই করবো তোমরাও তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।'

তবে বায়াতের আগে হাসান রা. কয়েকজনের পরামর্শ নেন। যেমন হাসান রা. চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রা.-কে বলেন: 'আমি একটা বিষয় ভেবেছি এবং আমি চাই আপনি এক্ষেত্রে আমাকে সঙ্গ দেবেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর জিজ্ঞেস করেন, 'বলেন, কী ভেবেছেন?' উত্তরে হাসান রা. বলেন, 'আমি মদিনা ফিরে যাবো এবং রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব মুআবিয়া রা.-এর হাতে সঁপে দেবো। অনেকদিন ধরেই তো এই বিবাদ চলছে। রক্তও ঝরেছে ঢের।'

আবদুল্লাহ ইবনু জাফর পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বলেন, 'পুরো মুসলিম উম্মাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলা আপনাকে উত্তম বদলা দান করুক।'

অতঃপর হাসান রা. সহোদর হুসাইন রা.-কে ডেকে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান। শুরুতে তিনি কিছুটা দ্বিমত করলেও হাসান রা. তাকে বোঝান এবং বিভিন্ন যুক্তি-প্রমাণের আলোকে তাকে সম্মত করেন। হুসাইন রা. সন্তুষ্টচিত্তে সায় দেন।

এভাবেই মাত্র ছয় মাস পর ৪১ হিজরি সনের ২৫ রবিউল আউয়াল (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুলাই) হজরত হাসান রাখি, উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতির বৃহত্তর স্বার্থে হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এ কারণেই ৪১ হিজরি সনকে ঐক্য ও সম্প্রীতির বছর বলে নামকরণ করা হয়।
হাসান রাযি.-এর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয় তার সম্পর্কে সত্যনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত এই ভবিষ্যদ্বাণী,

إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ
আমার এই দৌহিত্র একজন সর্দার। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিম জাতির বড় দুটি দলের মাঝে মীমাংসা করবেন। (সহীহ বুখারী, ২৭০৪ ও ৭১০৯)

হাসান রা.-এর মৃত্যু

হাসান রা. বাকি জীবন তিনি মদিনায় কাটান। ৪৯ বা ৫০ হিজরিতে যখন তার বয়স ৫৭ বছর, কেউ একজন অত্যন্ত গোপনে তাকে বিষ পান করিয়েছিল। বিষের প্রভাবে কয়েকদিন পর তিনি ইনতিকাল করেন। হুসাইন রা. জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য সায়িদ ইবনুল আস রা.-কে এগিয়ে দেন। সায়িদ ছিলেন বনু উমাইয়ার স্বনামধন্য ব্যক্তি। হাসান রা.-কে জান্নাতুল বাকিতে তার সম্মানিতা মা সায়্যিদা ফাতিমা রা.-এর পাশে দাফন করা হয়।

আবু হুরাইরা রা. মসজিদে নববিতে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'লোকসকল, আজ নবীজির প্রিয় ব্যক্তি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন। আবু হুরাইরা রা.-এর কথা শুনে একজন মানুষও চোখের পানি ধরে রাখতে পারে নি।

যদিও তার খিলাফাতকাল ছিল অতি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু উম্মাহর ওপর তার অনুগ্রহ সর্বদা টিকে থাকবে। তিনি অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসাধারণ হিকমত- কৌশলের প্রকাশ ঘটিয়ে উম্মাহকে ঐক্যের পথে নিয়ে এসেছিলেন। বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার সময় মুসলিমদের যুথবদ্ধ করা এবং ফিতনাবাজদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে তিনি যা করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা মুসলিমদের জন্য উত্তম।

মুয়াবিয়া রাযি. এর পরিচয়

হজরত মুয়াবিয়া রাযি, প্রসিদ্ধ মতানুসারে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (সা) এর চাইতে তিনি অনেক ছোট ছিলেন। তার উপনাম আবু আবদুর রহমান। পিতার দিক থেকে তার বংশপরম্পরা নিম্নরূপঃ

তিনি ছিলেন প্রথম উমাইয়া খলিফা এবং তিনি ছিলেন উমাইয়া বংশীয়। তার পিতা আবু সুফিয়ান রাযি.। উমাইয়া ইবনে আবদে শামস নামক ব্যক্তির নামানুসারে তাঁর বংশধারার নাম হয় উমাইয়া।

রাসূল সা. এর পূর্বপুরুষ ছিলো হাশেম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বদান্য ও দানশীল ব্যক্তি। তাঁর সাথে উমাইয়া বিন আবদে শামস নামে একজন ধনী ব্যক্তি দান-খয়রাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। তিনি যদিও হাশেম এর চেয়ে বেশি ধন-সম্পদ খরচ করত কিন্তু হাশেমের মতো বিখ্যাত হতে পারেনি যার ফলে হাশেমের সাথে তার শত্রুতা শুরু হয়ে যায় যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে তাঁর বংশধারার মধ্যেও এই শত্রুতা বজায় থাকে। হাশেমের বংশ থেকেই বনু হাশেম বা বনু আব্বাস এর উৎপত্তি। এখান থেকেই বনু হাশেম বা বনু আব্বাস এবং উমাইয়ার মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। পরবর্তীতে ষাট সত্তর বছর পরেও এই আব্বাসীয় এবং উমাইয়াদের যে দ্বন্দ্ব তা চলতে থাকে যা বনু হাশেম এবং উমাইয়া বিন আবদে শামস এর সময় থেকে শুরু হয়।

উমাইয়া ইবনে আবদে শামস এর সময় থেকেই তার বংশের নাম হয়েছিল উমাইয়া বংশ এবং উসমান (রা) তিনিও ছিলেন উমাইয়া বংশের খলিফা। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে শাসন ক্ষমতা উমাইয়া বংশ লাভ করে মুয়াবিয়া (রা) এর মাধ্যমে। এই কারণে তাকে প্রথম উমাইয়া খলিফা বলা হয়। আর প্রথম উমাইয়া বংশীয় খলিফা বলা হয় সেটা উসমান (রা) কে।

হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর গুণাবলী :

হজরত মুয়াবিয়া (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন মক্কা বিজয়ের বছর। তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান (রা) ও মাতা হিন্দা রাযি. তাঁর পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুয়াবিয়া (রা), মুসলিম অবস্থায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ খুব কম লাভ করেছেন। দুই-এক বছর পেয়েছিলেন। এ সময়টা তিনি নবীজির নির্দেশে ওহি লিপিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কেননা যে অল্প কয়েকজন সাহাবী তখন লেখাপড়া জানতেন তাঁর মধ্যে তিনি ছিলেন। এজন্য তিনি রাসূলুল্লাহ (সা) এর ওহী অর্থাৎ কুরআন তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। এটি একটি বিরাট সম্মান ও বটে। নবীজি (সা) হতে একশ তেষট্টিটি হাদিস তিনি বর্ণনা করেছেন। নবীজি একদিন মুয়াবিয়া রাযি.-এর জন্য বিশেষভাবে দোয়া করে বলেনঃ
"হে আল্লাহ, তাকে সত্যের পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত বানান এবং তাঁর মাধ্যমে অন্যদেরকেও হিদায়াত দান করুন।

তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মুসলিম উম্মাহর পরিস্থিতি অনুকূল হতে শুরু করে। কেননা আলী (রা) এর সময়েও পরিস্থিতি মোটেও সাভাবিক ছিলোনা। একটা গোলযোগপূর্ণ, বিদ্রোহপূর্ন পরিস্থিতি, সব মিলিয়ে খুব অস্থিতিশীল একটা পরিস্থিতি ছিলো। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা) যখন থেকে ক্ষমতা নিলেন তখন এই অস্থিতিশীল অবস্থা কেটে যেতে লাগলো এবং পুনরায় শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসলো। একথা সত্য যে, মুয়াবিয়া (রা) যখন খলিফা হলেন তখন তাঁর চেয়ে মর্যাদাগত দিক থেকে অনেক উঁচু মর্যাদার সাহাবা ছিলেন যা তিনি নিজেও অস্বীকার করতেন না। যেমন, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এ ধরনের প্রাথমিক যুগের অনেক সাহাবী তখনও জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব শুধুমাত্র ঈমান-আমলের উপর নির্ভর করেনা। এটা একটা কারণ হতে পারে। নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তাঁর মাঝে নেতৃত্বের গুনাবলী থাকতে হবে। এজন্য তিনি খলিফা হওয়ার পর যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন,
"হে লোকসকল, আমি তোমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। নিঃসন্দেহে অনেকেই আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন, আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর প্রমুখ। কিন্তু সম্ভবত নেতৃত্বদানে আমি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে কল্যাণকর বিবেচিত হব এবং তোমাদের শত্রুদের চোখে আমি সবচেয়ে অনিষ্টকর বিবেচিত হব।"

সত্যিকার অর্থেই তাঁর এই কথা পুরোপুরি ফলপ্রসূ ও সত্য হয়েছিলো। একদিকে যেমন মুয়াবিয়া রাযি.-উন্নত চরিত্র, আখলাক এবং দ্বীনের জ্ঞান সবদিক দিয়েই তিনি উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারি ছিলেন ঠিক তেমনি ইসলামি রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরা ও সীমানা রক্ষায় তাঁর প্রশংসনীয় ভূমিকা, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা ও শত্রুর মোকাবিলায় তার সবিশেষ দক্ষতা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রশাসন

ও রাজনীতির জ্ঞান খলিফা মুয়াবিয়া (রা) কে এক বিশেষ মর্যাদা এবং সম্মানের আসনে দাখিল করেছে।

তিনি যে একজন ভালো রাজনীতিবিদই ছিলেন শুধু তাই না তিনি একজন বড় ফকীহ ছিলেন। বিশুদ্ধ বর্ণনামতে হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) এর মতো বড় বড় সাহাবীরাও তাঁর ফিকহি প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন। ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে হজরত ইবনে আবি মুলায়কা রাযি, হতে উল্লেখ করেছেন হজরত মুয়াবিয়া (রা) এশার নামাজের পর এক রাকাত বিতির নামাজ আদায় করলেন। তখন সেখানে ইবনে আব্বাস রাযি.-এর জনৈক ক্রীতদাস উপস্থিত ছিল। সে ইবনে আব্বাস রাযি.-কে বিষয়টি অবগত করলে ইবনে আব্বাস (রা) উত্তর দিলেন, তাকে কিছু বলো না। কেননা, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্পর্শ লাভ করেছেন। বুখারি শরিফের আরেক বর্ণনায়। উল্লেখ আছে ইবনে আব্বাস রাখি, বলেন, 'কেননা, তিনি মুয়াবিয়া তো ফকিহ। এ থেকে বুঝা যায় তিনি দ্বীনের জ্ঞান গভীরভাবে রাখতেন।

অনেকেই মুয়াবিয়া (রা) এর ব্যাপারে বুঝের ভুলের কারণে মনে কিছুটা বিরূপ ধারণা চলে আসে। এর পিছনে মূল যে বিষয়টি কাজ করে সেটি হল তিনি আবু সুফিয়ানের ছেলে। কিন্তু আবু সুফিয়ান (রা) নিজেও একজন সাহাবী ছিলেন এবং তিনি শাহাদাতবরণ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা তাকে শাহাদাতের মর্যাদা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ইসলামগ্রহণের প্রাথমিক অবস্থায় যদিও তিনি একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ছিলেন না। তাঁর জাহেলি সমাজ বা গোত্রের প্রতি ভালোবাসা তখনও যায়নি। এসব কারণে আবু সুফিয়ান (রা) কে নিয়ে অনেকেই বিরূপ ধারণা রাখে। তিনি যখন সাহাবী হয়েছেন এবং তাঁর পরিবারসমেত ইসলাম গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর মর্যাদা বা সম্মান নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনো অবকাশ নেই।

ইসলামি শরিয়ায় একজনের দায়ভার আরেকজনের উপর বর্তায় না সুতরাং তাঁর বাবা কি করেছে তাঁর দায়ভার তাঁর ওপর আসবেনা। এছাড়া তাঁর বাবাও একজন সাহাবী ছিলেন যিনি আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিয়ে শহীদ হয়ে গেছেন এজন্য আমাদেরকে বিরূপ ধারণা করা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সাহাবীদের এই অন্তর্বিরোধ নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে বেশকিছু সমসাময়িক লেখক অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আদব রক্ষা করতে পারেনা এটাও একটি মূল কারণ আমাদের মনে তাদের সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার জন্য।

হজরত মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফত ও দায়িত্ব :

মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফতকাল ছিল ৪১ হিজরি রবিউল আউয়াল- ৬০ হিজরি রজব পর্যন্ত। অর্থাৎ জুলাই ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ-এপ্রিল ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

তিনি তাঁর জীবনের ৪০ বছর রাজনীতির মধ্যে কাটিয়েছেন ২০ বছর তিনি শামের গভর্নর ছিলেন। উমর (রা) এর সময় নিয়োগ পেয়েছিলেন এরপর উসমান (রা) আলী (রা) এর সময় ছিলেন। পরবর্তীতে হাসান (রা) এর সময় তিনি সমঝোতার মাধ্যমে খেলাফত নিয়ে নিলেন। তিনি ২০ বছর খলিফা ছিলেন এবং অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি খোলাফায়ে রাশেদার সময়কার যে শান্তি শৃঙ্খলা আরও নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে আবু বকর (রা) ও উমর (রা) এর সময়ের মতো শৃঙ্খলা, শাসন ও ন্যায়পরায়ণতা তিনি সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন এবং এই পুরোটা সময় কেউ তাঁর বিদ্রোহ করার সাহস কিংবা সুযোগ পায়নি বরং যারা তাঁর বিরোধী ছিল তারা পর্যন্ত মুয়াবিয়া (রা) এর খেলাফত মেনে নিতে এবং তাঁর হাতে খেলাফতের বায়'আত করতে বাধ্য হয়েছিল।

তিনি একজন বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং তিনি বুঝতেন কখন কোথায় কোন পদক্ষেপ নিতে হবে এবং যার সাথে যে ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি তাঁর সাথে সে ধ্বনের পদক্ষেপ নিতেন। যে সকল এলাকার মানুষ বেশি খারাপ সে সকল এলাকায় এমন গভর্নর পাঠাতেন যাকে মানুষ জমের মত ভয় করতো। এত কঠোর গভর্নর তিনি নিয়োগ দিতেন। ইরাকের লোকজন ছিল প্রচণ্ড রকম বিশ্বাসঘাতক। এইজন্য তিনি ইরাকে গভর্নর নিয়োগে সবচেয়ে কঠিন ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোকে ইরাকে নিয়োগ দিতেন। যখনই দেখা যেত বিদ্রোহীরা কোনো আপত্তি উত্থাপন করছে, কিংবা বিদ্রোহ করার মতো অবস্থা তিনি আগে খোঁজ নিতেন তারা কি চায়! যখন বলতো তারা টাকা-পয়াসা চায় বা অন্যকিছু চায় তাহলে তিনি এত বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা দিতো যে তারা এর লোভে বিদ্রোহ বন্ধ করে দিতো। আবার যদি দেখতেন কেউ যুদ্ধ করতে চায় তাঁর বিপরীতে তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিতেন এবং এই সৈন্যবাহিনী দিয়েই তাকে দমন করতেন। তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং প্রতাপশালী রাজনীতিবিদ ছিলেন। রাসূল (সা)- এর পরে সাহাবিদের মধ্য থেকে মুসলিম উম্মাহর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ যদি বলা হয় তাহলে তাঁর নাম নিঃসন্দেহে সবার শীর্ষে থাকবে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. মিনহাজুস সুন্নাহ গ্রন্থে লিখেছেন ইসলামি ইতিহাসে (খোলাফায়ে রাশিদিন-পরবর্তী যুগে) হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো শাসক নেই। প্রজাদের মুয়াবিয়া রাযি.-এ সঙ্গে তাঁর আচরণ ছিল শাসকের সদাচরণের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ। জনগণও তাকে ভালোবাসত। আর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

"তোমাদের সর্বোত্তম নেতা ও শাসক তারা, যাদেরকে তোমরা ভালোবাসো, আর তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে। তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে, তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো। আর তোমাদের নিকৃষ্ট নেতা হচ্ছে তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো, তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ দাও আর তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।

এই হাদীস থেকেও বোঝা যায় রাসূলুল্লাহ (সা) এর বর্ণনা অনুযায়ীও মুয়াবিয়া (রা) ছিলেন সর্বোত্তম নেতা এবং শাসক।

এছাড়া ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন রহ. তারিখে ইবনে খালদুন' গ্রন্থে লিখেছেন

“হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসকে খোলাফায়ে রাশিদিনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। কেননা, কর্ম ও কীর্তি, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা এবং নবীসংস্পর্শের ক্ষেত্রে তিনি খোলাফায়ে রাশিদিনেরই স্বার্থক অনুগামী ছিলেন।”

মুয়াবিয়া (রা) এর সময় শুধু যে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বজায় ছিল বা রক্ষিত হয়েছিল তাই নয় বরং তাঁর সময় ইসলামী সাম্রাজ্যের মানচিত্র বিস্তৃত হয়। দূর-দূরান্তের অঞ্চলে তিনি অভিযান পরিচালনা করতেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইরাকের অধিবাসীগণ বারবার বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করে সমকালীন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতি বিনষ্ট করছিল। এ কারণেই খলিফা হওয়ার পর তিনি হজরত মুগিরা বিন শুবা (রা) কে ইরাক অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। কেননা তিনি পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আপন প্রজ্ঞা ও কৌশলের পাশাপাশি বিচক্ষণতা ও কঠোরতা ব্যবহার করেন এবং ইরাকবাসীকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। ৪৯ হিজরিতে তিনি মারা গেলে তাঁর মৃত্যুর পর খলিফা মুয়াবিয়া (রা) ৫০ হিজরি সনে যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ানকে ইরাকের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তিনি মুয়াবিয়া (রা) এর আরেক ভাই। যিয়াদ ছিলেন স্বভাব-কঠোর একজন প্রশাসক। ইরাকবাসীর স্বভাব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তাই গভর্নরের দায়িত্ব লাভ করার পরই তিনি জনগণের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে তার সেই বিখ্যাত ভাষণটি প্রদান করেন, ইতিহাসে যা "আল-বাতরা নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সেই ঐতিহাসিক ভাষণের চুম্বকাংশ। নিম্নে তুলে ধরা হলো-

"আমার উপলব্ধি হলো তোমাদের এই পরিস্থিতির শেষাংশের সংশোধন সে পথেই হবে, যে পথে প্রথমাংশের সংশোধন হয়েছে: অর্থাৎ কোমলতা প্রদর্শন করা হবে; কিন্তু এমন কোমলতা নয়, যাতে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, আবার কঠোরতাও করা হবে; কিন্তু এমন কঠোরতা নয়, যাতে

জুলুম ও সীমালঙ্ঘন থাকবে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মনিবের কাছ থেকে ভৃত্যের, মুকিমের কাছ থেকে মুসাফিরের এবং সুস্থ ব্যক্তি হতে অসুস্থ ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করব। এমনকি তোমাদের কেউ যখন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, তখন ভয়ে মুখ থেকে কেবল এই প্রবাদ বাক্যই বের হবে

انج يا سعده فقد هلك سعيد

"হে সাদ, নিজের আত্মরক্ষার চিন্তা করো; সাইদের চিন্তা বাদ দাও। সে তো নিপাত গেছে। অথবা পরিস্থিতি এমন হবে যে, তোমাদের বর্শা আমার সামনে একেবারে সোজা হয়ে যাবে। “

সাবধান! রাহাজানি-ডাকাতির কোনো সংবাদ যেন আমার কানে না আসে। কোনো ডাকাত গ্রেফতার হয়ে আমার সামনে এলে তার পরিণতি একটাই-দুনিয়া থেকে বিদায়। আমি তোমাদেরকে কেবল ততটুকু অবকাশ দেবো, যতটুকু সময়ের মধ্যে সংবাদ কুফায় পৌঁছায় এবং সেখান থেকে আবার বার্তাবাহক আমার কাছে ফিরে আসে। কারও মুখ থেকে যেন জাহিলি কোনো শ্লোগান বের না হয়। কেউ জাহিলি শ্লোগান দিলে আমি তাঁর জিহ্বা কেটে ফেলব। তোমরা এমন সব আচরণ ও ঘটনার জন্ম দিচ্ছ, যা ইতিপূর্বে কেউ করেনি।

আমি প্রত্যেক অপরাধের জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করেছি। কেউ কাউকে ডুবিয়ে মারলে আমিও তাকে ডুবিয়ে মারব। কেউ অন্যের বাড়িতে আগুন দিলে আমি তাকে আগুনে জ্বালাব। কেউ অন্যের গৃহপ্রাচীর ছিদ্র করলে আমি তাঁর হৃৎপিণ্ড ছিদ্র করে দেবো। কেউ অন্যের জন্য কবর খনন করলে সে কবরে আমি তাকে জীবন্ত দাফন করব। নিজেদের হাত ও বচন আমার দিকে প্রসারিত করো না, আমিও আমার হাত ও শাস্তি প্রসারিত করব না। তোমাদের কারও আচরণে উচ্চারণে সাধারণ জনগণের জীবনাচার- বিরোধী কোনও কিছু প্রকাশ পেলে আমি তাঁর শিরচ্ছেদ করব।

লোকসকল, আমরা তোমাদের নেতা, তোমাদের নিরাপত্তারক্ষক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যে নেতৃত্ব-ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তাঁর ভিত্তিতেই আমরা তোমাদের শাসন করব। আল্লাহ আমাদেরকে যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দান করেছেন, তা দিয়ে আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। তোমাদের প্রতি আমাদের এই অধিকার আছে যে, তোমরা আমাদের মর্জিমতো আমাদের আনুগত্য করবে। আমাদের প্রতিও তোমাদের এই অধিকার আছে যে, শাসনকার্যে আমরা তোমাদের প্রতি ন্যায়বিচার করব। সুতরাং আমাদের নিঃশর্ত আনুগত্য করে তোমরা নিজেদেরকে সম্পদ ও ন্যায়বিচারের অধিকারী বানাও। আর শুনে রাখো, অন্যান্য বিষয়ে ছাড় দিলেও তিনটি বিষয়ে আমি কখনোই শিথিলতা করব না। গভীর রাতে অভাবী বা বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি আমার দরজায় কড়া নাড়লে আমি তাকে ফিরিয়ে দেবো

না। কারও পাওনা অনুদান যথাসময়ে প্রাপ্তিতে আমি বাধা দেবো না। তোমাদের কোনো বাহিনীকে আমি শত্রুভূমিতে আটকে রাখব না। তোমাদের প্রতি দাবি হলো, তোমরা নিজেদের নেতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণ ও সততার দোয়া করবে। তারা তোমাদের নেতা, তোমাদের শৃঙ্খলারক্ষক। তারা তোমাদের আশ্রয়স্থল; তাদের কাছেই তোমরা আশ্রয় নেবে। মনে রেখো, তোমরা ভালো মানুষ হয়ে গেলে তারাও তোমাদের সঙ্গে ভালো মানুষ হয়ে যাবেন। অন্তরে তাদের প্রতি বিদ্বেষ ধারণ করবে না, তাহলে সব সময় অস্থিরতা ও কষ্টেই নিপতিত থাকবে। তাদের কাছে এমন কিছু প্রত্যাশা করবে না, যা পুরণ করলে তোমাদের অকল্যাণ হবে।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহায়ক বানান। আমি তোমাদের মাঝে কোনো আইন জারি করলে তা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেবে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে অনেকেই আমার হাতে মারা পড়বে। সুতরাং প্রত্যেকে আত্মরক্ষা করো। প্রত্যেকে চেষ্টা করো আমার শিকারের তালিকায় যেন নিজের নাম না ওঠে!
এই ঐতিহাসিক ভাষণের মূল কথা ছিলো,
"যদি তোমরা নরম থাকো তাহলে কোন সমস্যা নেই কিন্তু যদি তোমারা বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা বা বিদ্রোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করো তাহলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে" এমন একটি বার্তা তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ছিল।

এই কঠোর প্রশাসননীতির মাধ্যমে এবং কখনো কখনো নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে যিয়াদ বসরা ও পুরো ইরাক অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। জনগণ যিয়াদকে প্রচণ্ড ভয় করত। সমাজের কেউ কারও দ্বারা নিরাপত্তাহানির আশঙ্কা করত না। এমনকি পথে কারও কোনো বস্তু পড়ে গেলে অন্যরা ভুলেও সেদিকে তাকাত না। মালিক যথাস্থানে তার বস্তু পেয়ে যেত। মহিলারা ঘরের দরজা বন্ধ না করেই নিশ্চিন্তে রাত্রিযাপন করতে পারত।

মুয়াবিয়া রাযি, প্রথমবারের মতো ইসলামি রাষ্ট্রে ডাকব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। ডাকব্যবস্থাকে কার্যকর ও গতিশীল করে তুলতে সুদীর্ঘ পথের নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর একটি মনজিল নির্ধারণ করা হয়েছিল। খলিফার বার্তা বিভিন্ন নগরীতে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি মনজিলে বাহনজন্ত প্রস্তুত থাকত। রাজধানী হতে কোনো বার্তা প্রেরণ করা হলে ডাকবিভাগের প্রধান দ্রুত তা প্রথম মনজিলে পৌঁছিয়ে দিতেন। প্রথম মনজিলের দায়িত্বশীল দ্রুত তা পৌঁছিয়ে দিতেন পরবর্তী মনজিলে। এভাবে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে বার্তাটি পৌঁছে যেত কাঙ্ক্ষিত গভর্নর বা কর্মকর্তার কাছে।

মুয়াবিয়া (রা) এর খিলাফতকালে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হলো, ইসলামী সাম্রাজ্যের সীমানা বিস্তারের জন্য তিনি সেনাবাহিনী ও নৌ-বাহিনী পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় আগে থেকেই

মুসলিমদের নৌবাহিনী ছিল। অনেক দূরের পথ, ভিন্ন মহাদেশে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হবে এই সব জায়গায় তিনি সীমানা বিস্তারিত করেছেন বলতে শুধু বর্ডার বিস্তৃত করেছেন তাই নয় সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তাঁর নৌবাহিনীর মাধ্যমে দূর-দূরান্তের বিভিন্ন এলাকা তিনি জয় করেছিলেন।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর আমলে মুসলিম নৌবহরের রণতরীর সংখ্যা সতেরোশ-তে পৌঁছেছিল। প্রতিটি যুদ্ধজাহাজ ছিল পর্যাপ্ত সৈন্য ও যুদ্ধাস্তরে সমৃদ্ধ। তিনি প্রথমে আক্কায় একটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন, এরপর ৫৪ হিজরি সনে দ্বিতীয়বারের মতো মিশরের রওজা দ্বীপে আরেকটি শিপইয়ার্ড নির্মাণ করেন। শিপইয়ার্ড নির্মাণের কিতৃত্ব এককভাবেই তাঁর এবং তিনিই প্রথম শিপইয়ার্ড নির্মান করেন।

মুয়াবিয়া রাযি.-এর শাসনামলে দুদুবার স্থল ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশ্য দু-বারই মুসলিম অভিযাত্রীদল কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। এসব অভিযানে প্রবীণ সাহাবিগণসহ বিশিষ্ট সাহাবিদের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কনস্টান্টিনোপলকে মুসলমানদের অধিনে এনে দেন।

মুয়াবিয়া (রা) যে তাঁর নৌবাহিনীর মাধ্যমে কন্সটান্টিনোপল আক্রমণ করবেন এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) একটি ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন-
"আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে, তারা যেন জান্নাত অনিবার্য করে ফেলল। আমার উম্মতের প্রথম যে দলটি (রোমান সম্রাট) কায়সারের নগরী আক্রমণ করবে, তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে।"
হাদিসে কায়সারের নগরী দ্বারা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল উদ্দেশ্য। এই হাদিস থেকে দেখা যায় মুয়াবিয়া (রা) ও তার বাহিনী কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধ করার মাধ্যমে দুইটা ফজিলত লাভকরেছেন।

1. তারা নিজেদের জন্য জান্নাতকে ওয়াজিব করে নিয়েছেন।
2. তারা নিজেদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা কে ওয়াজিব করে নিয়েছেন।

এই হাদিসটা থেকেও মুয়াবিয়া (রা) এর সম্মান ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা প্রমাণিত হয়।

পরবর্তী খলিফারূপে ইয়াজিদকে নির্বাচন

মুআবিয়া রা.-চাইতেন, রাষ্ট্র অভ্যন্তর ও বহির্দেশে সুসংহত ও সুদৃঢ় হবে। এ জন্য তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় এমন পরিবর্তন আনা জরুরি ভাবলেন, যার দ্বারা গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য তিনি আরব-নেতৃবৃন্দকে সংগঠিত ও সুদৃঢ় করেন। আর নিজ গোত্রীয় শক্তির ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যার কারণে আবশ্যিকরূপে বনু উমাইয়্যার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু সাধারণত ক্ষমতার পালাবদলের স্তর গৃহযুদ্ধের উৎস হয়, এ জন্য মুআবিয়া রা.-এর আশঙ্কা ছিল, তার ওফাতের পর পাছে আবার কোনো সঙ্কট সৃষ্টি না হয়। তিনি ক্ষমতার পালাবদলকে এমন জটিলতা থেকে দূরে রাখতে চাইতেন, যা মতভিন্নতা ও কেন্দ্রবিমুখতার কারণে পরিণত হবে। তিনি অন্যান্য রাষ্ট্রের নিয়ম-পদ্ধতি হতে কিছু বিষয় প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য করে গ্রহণেরও পক্ষে ছিলেন। আর শরয়ি দিক দিয়ে তার অবকাশও ছিল।

এ পরিস্থিতিতে স্বীয় সরকারের ষোলতম বছর [৫৬ হিজরিতে] মুআবিয়া রা. এক অস্বাভাবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি তার পুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে ঘোষণা করেন।

ইযাজিদের মনোনয়ন কি অন্যান্য খলিফা নির্বাচনের নিয়মে ছিলো ?

মুসলিমদের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত থেকে শুরু করে একে একে হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.)ও হাসান (রা.) সকলের ক্ষেত্রে খলিফা নির্বাচনে বড় বড় বুজুর্গ ব্যক্তিরা ছিলেন। সাধারণ জনগন ও সম্মানিত ব্যক্তিদের মতামতের ভিত্তিতেই পরবর্তী খলিফা নির্বাচন করা হতো।

যদিও সাহাবায়ে কিরামের মতো শ্রে-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে একজন নগণ্য ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত বানানো বিস্ময়কর ছিল বটে, তবে মুআবিয়া রা. দেখতে পাচ্ছিলেন, তার সরকারের অধিক উমাইয়্যা ও শামবাসীর শক্তির ওপর নিহিত। সুতরাং যদি তিনি পরিবারের বাইরের কোনো উত্তম ব্যক্তিকে মসনদের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন, এরা গোত্রীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে তাকে মেনে নেবে না। আর উম্মাহ গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে। তাই ইয়াজিদকে খলিফা হিসেবে মনোনয়নের ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া (রা.) পূর্বের মত কোন ব্যবস্থার আয়োজন করেননি।

জুমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত হচ্ছে, মুআবিয়া রা.-এর এই পদক্ষেপের দুটি দিক ছিল। একটি নিজের পরবর্তী খলিফা নির্দিষ্ট করা। যাতে উম্মাহ একতাবদ্ধ ও একমত থাকে। এটা একেবারে সঠিক।

অপর দিকটি হচ্ছে, নিজের পুত্রকে খলিফারূপে মনোনয়ন দেওয়া। এই দ্বিতীয় দিকটিতে মুআবিয়া রা. থেকে ইজতিহাদি বিভ্রাট হয়েছিল। প্রশাসনিক অভিমত ও রাজনৈতিক প্রচেষ্টার স্তরে এ সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণিত হয় নি। তথাপি তিনি তার এ কর্মে সদিচ্ছুক, নিষ্ঠাবান, সৎ ও উম্মতের কল্যাণকামী ছিলেন। তার কাছে এমন যুক্তিপ্রমাণ অবশ্যই ছিল, যার ভিত্তিতে তিনি এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার এ সিদ্ধান্ত সার্বিকভাবে শরয়ি বৈধতার সীমার আওতাভুক্ত ছিল।

রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের সূচনা

মুআবিয়া রা.-এর দৃষ্টিতে শামবাসীর নিকট পরবর্তী খলিফার গ্রহণযোগ্য হওয়া বেশ জরুরি ছিল। নতুবা কেন্দ্রে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং পুরো ইসলামি দুনিয়ার ওপর এর প্রভাব পড়বে। সুতরাং তিনি ক্ষমতার পালাবদলের ক্ষমতা নিজের কাছে রাখলেন এবং স্বীয় সুহৃদদের পরামর্শে নিজপুত্র ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা ঘোষণা করলেন। যদিও এ ধরনের সিদ্ধান্ত রাজতন্ত্র ও উত্তরাধিকারী সরকার বা পরিবারতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু মুআবিয়া রা. ভাবতেন, যদি মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শরিয়তের শাসন অব্যাহত থাকে, তাহলে উত্তরাধিকারী সরকার বা পরিবারতন্ত্রের অবকাশ রয়েছে। কেননা, এর নিষেধাজ্ঞায় কুরআন ও সুন্নাতের কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান নেই। বরং কুরআনের বাণী থেকে স্বয়ং রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের অবকাশ প্রমাণিত হয়।

সাফিনা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ

-আমার উম্মতের মধ্যে খিলাফাত থাকবে ৩০ বছর। এরপর হবে রাজতন্ত্র। (সুনান আত-তিরমিযী, ২২২৬)

খুলাফায়ে রাশিদীনের খিলাফাতকাল ছিল ৩০ বছর। তন্মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) (১১-১৩ হি.) উমর (রা.) (১৩-২৩ হি.) উসমান (রা.) (২৩-৩৫ হি.) এবং আলী (রা.) (৩৫-৪০ হি.)। আলী (রা.) এর শাহাদাতের পর হাসান ইবন আলী (রা.) (৪০-৪১ হি.) আরও ৬ মাস দায়িত্ব পালন করার পর খিলাফাতে রাশিদার ৩০ বছর সমাপ্ত হয় এবং মুয়াবিয়া রা. এর সময় থেকে এভাবেই রাজতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্রের সূচনা হয় ।

আল্লামা ইবনু খালদুন রহ. মুআবিয়া রা.-এর এই সিদ্ধান্তের কারণের ওপর আলোকপাত করেছেন-

'যে বিষয়টা মুআবিয়া রা. কে অন্যদের স্থলে ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফাহ বানাতে তৎপর করে, তা ছিল উম্মতের ঐক্য ও ঐকমত্যের স্বার্থ। বনু উমাইয়্যার ব্যবস্থাপনা পরিষদ এতে একমত ছিল। ওই সময় তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারও ওপর সম্মত ছিল না। তারা কুরাইশের সবচেয়ে সুদৃঢ় শাখা ছিল। আর জাতির অধিকাংশই তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। এ জন্য মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে প্রাধান্য দিলেন এবং উত্তমের স্থলে অনুত্তমকে বেছে নিলেন। এটা ঐক্য ও ঐক্যমতের জন্যই করেছেন, শরিয়তে যার অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের কারণ কি ছিলো

শুরুতে মুআবিয়া রা.-এর মানসিকতায় ইয়াজিদের স্থলাভিষিক্ততার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। একবার ইরাকের গভর্নর জিয়াদ কোনো এক কাজের জন্য কাবীসা ইবনু জাবিরকে মুআবিয়া রা.-এর কাছে। প্রেরণ করলেন। তিনি আলোচনার মাঝে মুআবিয়া রা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন- 'আপনার পরে খিলাফাতের দায়িত্ব কে সামলাবে?

মুআবিয়া রা. বললেন, "বিষয়টি মুসলিমদের দলের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হোক। তারা বেছে নেবে কুরাইশের ভদ্র ব্যক্তি সায়িদ ইবনু আসকে; অথবা লজ্জাশীল, পরহেজগার ও দানশীল কুরাইশ যুবক আবদুল্লাহ ইবনু আমিরকে; অথবা ভদ্র নেতা হাসান ইবনু আলিকে; অথবা বুরআনের কারি, আলেমে দ্বীন ও শরিয়তের সীমারেখার কঠোর অনুসারী মারওয়ান ইবনু হাকামকে; অথবা ফকীহ আবদুল্লাহ ইবন উমরকে; অথবা মেধাবী ও সচেতন মানুষ আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইরকে।

এ ঘটনা হাসান ইবনু আলি রা.-এর জীবদ্দশার [অর্থাৎ ৪৯ হিজরি সন বা তার আগের]। এতে অনুধাবন করা যায় যে, ওই সময় পর্যন্ত মুআবিয়া রা.-এর কল্পনাতেও খিলাফাতের বিষয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যতিরেকে অন্য কোনো চিন্তা ছিল না। আর তার নিকট খিলাফাতের হকদার অন্য ব্যক্তিরাই ছিলেন।

পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে মুআবিয়া রা.-এর ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত করার ধারণা আসে। তিনি গভীর চিন্তাভাবনা করার পর যাকে বাস্তবে রূপ দেন। সম্ভবত চিন্তাভাবনার এ সময়টা ছিল ৪৯ হিজরি থেকে নিয়ে ৫২ হিজরি সালের মাঝামাঝি। এ সময় হাসান রা. পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। হাসান রা.-এর প্রতি ভালোবাসার দাবীদাররা মুআবিয়া রা.-এর নীতির বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলাপরায়ণ ব্যক্তিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। কুফায় বিদ্রোহের আশঙ্কা দেখা দেয়। আর ৫১ হিজরি সনে হুজুর ইবনু আদি রা.-এর মতো বুজুর্গের মূল্যবান জীবন কুরবানী

হয়ে গেছে। সম্ভবত এ পরিস্থিতির কারণে মুআবিয়া রা. খিলাফাতের বিষয়টি মুসলিমদের শুরার ওপর সোর্য়িদ করতে নিশ্চিন্ত হতে পারেননি।

আবার ইয়াজিদ কুসতুনতুনিয়া' অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন, আমিরুল হজ (হজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার নেতা) হিসেবে দায়িত্ব পালন যার দ্বারা মুআবিয়া রা. নিশ্চিন্ত হন যে, পুত্রের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে। এই দিকগুলো সামনে রেখে তিনি ইয়াজিদকে স্থলাভিষিক্ত বা তার পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নেন। আর এ ব্যাপারে কতিপয় আমিরের সাথে পরামর্শও করেন।

খিলাফত শেষের আগেই কেন ইয়াজিদকে খলিফা নির্বাচিত করা হয়

আমিরে মুআবিয়া রা.-এর ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন প্রদান একটি যাচাই প্রক্রিয়া বা 'টেস্ট কেস' ছিল। যাকে পরবর্তী ফলাফলের ভিত্তিতে সফলতা বা ব্যর্থতা বলে অভিহিত করা যায়। আমিরে মুআবিয়া রা. এই যাচাই প্রক্রিয়ার ফলাফল দেখার জন্য জীবিত ছিলেন না। যাচাই প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে, কিন্তু এর ভিত্তিতে আমিরে মুআবিয়া রা.-এর উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করা ভদ্রতা ও ন্যায়বিচার বহির্ভূত আচরণ।

নিঃসন্দেহে এ যাচাই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে। যদি মুআবিয়া রা. ওই সময় জীবিত থাকতেন, তাহলে নিশ্চয় বিষয়টিকে ওখানেই শেষ করে দিতেন। এছাড়াও মুআবিয়া রা. এ ব্যাপারে ইসতেখারা ও দুআর পথও অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জুমআর দিন মিম্বরে এই দুআ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, যদি তুমি জানো যে, আমি ইয়াজিদকে তার যোগ্যতার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়েছি, তাহলে এই পদকে পরিপূর্ণতা দান করো, যা আমি তাকে দিয়েছি। আর যদি আমি তাকে আমার ভালোবাসার কারণে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়ন দিয়ে থাকি, তাহলে তার জন্য এই পদকে পূর্ণতা দান করো না, যা আমি তাকে দিয়েছি।এর দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, মুআবিয়া রা. পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে উম্মতের কল্যাণকামিতায় ইয়াজিদকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত, নিয়েছিলেন। আর তিনি ইয়াজিদের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত থাকাসত্ত্বেও নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, ইয়াজিদ সঠিকভাবে সরকার পরিচালনা করবেন। যার কারণে মুআবিয়া রা. জরুরি ব্যবস্থাপনার আয়োজন করে তাকে দুআ, মূল্যবান উপদেশ ও যোগ্য সহচরবৃন্দের পাথেয় দিয়ে যাচ্ছিলেন। সর্বোপরি তিনি গায়েবের জ্ঞানী ছিলেন না যে, ভবিষ্যতের মর্মান্তিক পরিস্থিতি অবলোকন করবেন এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন।

ইয়াজিদের যোগ্যতা

মুআবিয়া রা.-এর সিদ্ধান্তে একমত হয়ে যারা ইয়াজিদের মনোনয়নকে মেনে নিলেন, তাদের অবস্থানও শরয়ি সীমার বাইরে ছিল না। পরবর্তী শাসক মনোনয়নের শর্তাবলির আলোকে বিচার করা হলে দেখা যাবে, ইয়াজিদের প্রজ্ঞা, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া, মুসলিম হওয়া, সুস্থ ও কুরাইশী হওয়া এমন বাস্তবতা, যার দলিলের কোনো প্রয়োজন নেই। আবার ৫০ হিজরি সনে ইয়াজিদ কুসতুনতুনিয়া' অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আর ৫১ হিজরি সনে আমিরুল হজ (হজের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার নেতা) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। যার দ্বারা মুআবিয়া রা. নিশ্চিন্ত হন যে, পুত্রের মাঝে নেতৃত্বের যোগ্যতা রয়েছে।
এর দ্বারা তার মধ্যে যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রশাসনে কোনো-না-কোনো স্তরের যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে এটা মেনে নেওয়ার অবকাশও বিদ্যমান ছিল যে, তিনি খিলাফাতের যোগ্য।

এখন থাকল ইয়াজিদের মদপান ও অন্যান্য খারাপ কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার বিষয়টি। তো যে সব বর্ণনা এটা প্রকাশ করে যে, তিনি আমিরে মুআবিয়া রা. এর জীবদ্দশায় এসব কর্মকাণ্ডে অভ্যস্ত ছিলেন, তা জয়িফ (দুর্বল) ও যুক্তির বিচারে সন্দেহযুক্ত।

হ্যাঁ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি নেতৃত্বসুলভ উপযুক্ততা এবং ধর্মীয় ত্যাগ ও কষ্ট সাধনায় তৎকালীন অপর যোগ্য ও সৎ ব্যক্তিদের চেয়ে বেশ পিছে ছিলেন। তার মধ্যে দূরদর্শিতারও অভাব ছিল। স্বভাবে ঝটপটপ্রিয়তা, অস্থির মানসিকতা ও বেপরোয়া মনোভাব স্পষ্ট ছিল। খলিফা হওয়ার পর তার কিছু সিদ্ধান্ত যেমনটা প্রমাণ করেছে। এছাড়াও তিনি বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে সতর্ক সীমার বাইরে অধিক লিপ্ত থাকতেন।

যদি এ গুণাবলি কোনো সাধারণ মানুষের মধ্যে হতো, তাহলে সম্ভবত কেউ তার ওপর আপত্তি তুলত না; কিন্তু যেহেতু ইয়াজিদকে ভবিষ্যতের খলিফা হিসেবে দেখা হচ্ছিল, এ জন্য দোষগুলো বেশ মারাত্মক অনুভব হচ্ছিল। মুআবিয়া রা.-এর নিজের কাতারে শামিল বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন আমর ইবনু হাযম রহ., আহনাফ ইবনু কাইস রহ. ও জিয়াদ ইবনু আবি সুফইয়ানের ইয়াজিদের মনোনয়নের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে একমত না হওয়া সম্ভবত ইয়াজিদের গুণাবলিতে এ ধ্বনের ঘাটতির কারণে হয়েছিল। পক্ষান্তরে মদিনার প্রবীণদের আপত্তি এই কারণেও ছিল যে, তারা ইসলামি শুরা পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা এবং দেখছিলেন।

তাবারির বর্ণনা- মুআবিয়া রা. যখন ইয়াজিদের পক্ষে বাইআত গ্রহণের ইচ্ছা করলেন, তখন জিয়াদের কাছে পত্র লিখে পরামর্শ চাইলেন।

জিয়াদ উবাইদ ইবনু কাবকে ডেকে এ ঘটনা শুনিয়ে বললেন, 'এ ব্যাপারে আমিরুল মুমীনীনের জনগণের বিরোধিতার আশঙ্কা রয়েছে। আর তিনি তার সমর্থন চাচ্ছেন এবং আমার কাছে পরামর্শ চেয়েছেন। এটা ইসলামের বিষয় ও বেশ দায়িত্বশীলতার ব্যাপার। ইয়াজিদের মাঝে কিছু বেপরোয়াভাব রয়েছে এবং শিকার করে বেড়ানোও তার খুব শখ। তুমি আমিরুল মুমীনীনের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে ইয়াজিদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত করো এবং বলো, তিনি যেন এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করেন।'

উবাইদ বললেন, 'আমিরুল মুমীনীনকে তার পুত্র সম্বন্ধে বিরূপচিত্ত করানো সঙ্গত হবে না। আমি গিয়ে ইয়াজিদের সাথে সাক্ষাৎ করি। তাকে বলি যে, আমিরুল মুমীনীন তাকে পরবর্তী খলিফারূপে মনোনয়নের পরামর্শ করছেন। সে যেন এমন কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে। যাতে করে জনগণের কথা বলার ও বিরোধিতা করার সুযোগ না ঘটে। জিয়াদ এ অভিমত সমর্থন করেন এবং উবাইদকে ইয়াজিদের নিকট পাঠিয়ে দেন। উবাইদের বোঝানো দ্বারা ইয়াজিদ তার অনেক কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করে।

মুসলিমদের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে পরিবারতন্ত্রে পরিবর্তন হতে বাহ্যত ইয়াজিদের দুর্বলতাগুলো নিঃসন্দেহে আমিরে মুআবিয়া রা.-এর কাছে গোপন ছিল না; কিন্তু তিনি হয়তোবা আশা করেছিলেন, দায়িত্বের বোঝা অর্পণের পর এই ত্রুটিগুলো দূর হয়ে যাবে। তিনি হয়তোবা এটাও আশা করেছিলেন যে, ইয়াজিদ প্রতিটি পদক্ষেপে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে যুক্ত শীর্ষ যোগ্যতাসম্পন্ন আমির ও উপদেষ্টাদের পথপ্রদর্শন পেতে থাকবে। যার কারণে তিনি ভুল পদক্ষেপ থেকে বেঁচে থাকবেন।

এর পাশাপাশি আমিরে মুআবিয়া রা. নিজেও ইয়াজিদকে তার অভিজ্ঞতার আলোকে এমন এমন উপদেশ ও পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন, যাকে সামনে রেখে তিনি একজন সফল শাসক হতে পারতেন।

ইয়াজিদের প্রতি মুআবিয়া রা.-এর অসিয়ত

মুআবিয়া রা. পরবর্তী উম্মতের জন্য বেশ চিন্তা করতেন। তিনি চেয়েছিলেন, ইয়াজিদ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক আদর্শ শাসক প্রমাণিত হবেন। উম্মত তার ওপর ঐকমত্য থাকবে। চতুর্দিকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করবে। কারও ওপর কেউ নির্যাতন করবে না, কারও অধিকারও হরণ হবে না। যেহেতু এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি দায় ইয়াজিদের ওপরই আরোপিত হবে, এ জন্য মুআবিয়া রা. তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত করেন, যার প্রতিটি বাক্য সোনার হরফে লিখে রাখার মতো। এ অসিয়তগুলো তার পরিণামদর্শিতা ও সর্তকতা, চিন্তা ও দর্শনের গভীরতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং উম্মতের কল্যাণকামনার শ্রেণ দলিল।

মুআবিয়া রা. ইয়াজিদকে বলেন-

- ❖ অল্লাহকে ভয় করবে। আমি তোমার জন্য খিলাফাতের এ পদটি চূড়ান্ত করে দিয়েছি। তোমাকে এর দায়িত্বশীল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- ❖ যদি উত্তমের সাথে থাকো, তাহলে সেটা আমার সৌভাগ্য হবে। আর যদি এমনটা না করো, তাহলে সেটা হবে তোমার দুর্ভাগ্য।
- ❖ মানুষের সাথে কোমল আচরণ করবে।
- ❖ 'তোমার কাছে তোমার সম্বন্ধে যে সব হীনকর ও আপত্তিজনক কথা পৌঁছবে, সেগুলো উপেক্ষা করবে। সম্ভ্রান্তদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। তাদের সম্মানহানি থেকে বেঁচে থাকবে। তাদের নিজের কাছে রাখবে।
- ❖ যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হবে, তখনই প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সৎ ও পরহেজগার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করবে। তাদের অভিমতের বিরোধিতা করবে না।
- ❖ নিজের মতের ওপর কখনো চাপ প্রয়োগ করবে না। কেননা, শুধু এক মানসিকতা থেকে আসা অভিমত সঠিক হয় না।
- ❖ নিজের আত্মার পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করবে। মানুষেরাও তোমার সাথে সঠিকভাবে চলবে।
- ❖ মানুষকে কখনো কোনো আপত্তির সুযোগ দেবে না। কেননা, মানুষ মন্দ কথা দ্রুত ছড়িয়ে দেয়।
- ❖ নিয়মিত জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করতে থাকবে।

যদি এই উপদেশগুলো মেনে চলো, তাহলে মানুষ তাদের ওপর তোমার অধিকার অনুধাবন করবে। আর তোমার সরকার শক্তিশালী থাকবে।

মুআবিয়া রা.-এর শেষ দিনগুলি

মুআবিয়া রা.-এর বয়স ৮০ বছর পার হয়ে গেছিল।' বার্ধক্য অবস্থায় সরকারি কাজকর্মের কষ্ট তাকে ক্লান্ত করে দিয়েছিল। তিনি চিরস্থায়ী ডাকের পদধ্বনি অনুভব করছিলেন। এক দিন তিনি খুতবায় বললেন-

"হে লোকসকল, আমি কর্তিত ফসলের একটি অংশ। আমি তোমাদের দায়িত্বশীল হয়েছি। আমার পরও শাসক আসবেন। আমি তাদের থেকে উত্তম। যেমনটা যারা আমার থেকে আগে চলে গেছেন, তারা আমার থেকে উত্তম। [হাদিসে বলা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলাও তার সাথে মিলিত হতে ভালোবাসেন। হে আল্লাহ, আমি আপনার সাক্ষাৎকে ভালোবাসি, আপনিও আমার সাথে সাক্ষাৎ ভালোবাসেন। আর এতে বরকত প্রদান করো।

তিনি এতটাই দুর্বল হয়ে গিয়েছিলেন যে, কজি দুটোকে শুকনো ডালের মতো মনে হতো। তিনি বলতেন, 'ব্যস দুনিয়া এরচেয়ে বেশি কিছু নয়, যা আমরা উপভোগ করেছি ও উপার্জন করেছি। আল্লাহর কসম, আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে আমি তিন দিনের বেশি তোমাদের মাঝে থাকব না।

মুআবিয়া রা.-এর কাশিতে রক্ত আসতে লাগল। শেষ দিনগুলিতে বিছানাগত হয়ে গেছিলেন। তার দুই পুত্র তার পার্শ্ব পরিবর্তন করে দিতেন। আর তিনি বলতেন, 'এরা ওই ব্যক্তিকে ওলটপালট (পার্শ্ব পরিবর্তন) করে দিচ্ছে, যে দুনিয়াকে ওলটপালট করে দিতে দক্ষ ছিল।'

রোগের এত তীব্রতাসত্ত্বেও শাসনের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও দাপট টিকিয়ে রাখার এতটাই খেয়াল ছিল যে, সাধারণ জনগণের মাঝে তার বিছানাগত হওয়ার বিষয়টি একেবারে প্রকাশ হতে দেননি। যখন মানুষ দেখতে আসত, গৃহবাসীদের বলতেন, 'আমাকে সুরমা ও তেল লাগিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে তখন তিনি বসিয়ে দাও। কোনো আগন্তুক যেন না বসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে চলে যাবে।মানুষ ভেতরে আসে। সালাম করে। আর তাকে হাসিখুশি দেখে এ বলতে বলতে চলে যায় যে, আমিরুল মুমিনিন ঠিকঠাক আছেন।
মানুষজন চলে যাওয়ার পর তিনি কবিতা পাঠ করতেন-

أني لريبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ
وَتَجَلْدِي لِلشَّامِنِينَ أُرِيهِمْ

অকল্যাণকামীদের সামনে আমি শক্তিশালী হয়ে থাকি। যাতে তাদের দেখাই যে, যুগের যাতনাসত্ত্বেও আমি দুর্বল হই নই ।

الْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ
وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارُهَا

কিন্তু মৃত্যু যখন তার থাবায় পিষে দেবে, তখন সর্বপ্রকার তাবীজকে অকার্যকর পাবে।
একজন সাচ্চা মুমিনের মতো মুআবিয়া রা.-এর শিরায় শিরায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। মৃত্যুরোগে পরিবারের লোকদের বললেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একটি জামা পরিধান করিয়েছিলেন। ওটা আমি যত্ন করে রেখেছি। একবার আমি তার নখ মুবারক কেটেছিলাম। সেটাও একটি শিশিতে সংরক্ষণ করে রেখেছি। আমি মারা গেলে ওই জামাতেই আমাকে কাফন দেবে। আর ওই কর্তিত নখ মুবারক পিষে আমার চোখে মুখে ছিটিয়ে দেবে। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এগুলোর বরকতে আমার ওপর দয়া করবেন।'

আল্লাহভীতির এমন এক অবস্থা ছিল যে, ওফাতের আগে তিনি তার অর্ধেক সম্পদ বাইতুল মালে জমা করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। যদি অজান্তে বাইতুল মালের অর্থের মধ্যে কোনো

কমবেশি হয়ে থাকে, এগুলো যেন তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে কাজ করে। শেষ মুহূর্তে ওয়ারিসদের বললেন, "মহান ও শ্রে'আল্লাহকে ভয় করবে। যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাকে হেফাজত করেন। আর যে
আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে না, তার হেফাজতকারী কেউ নেই।" কিছুক্ষণ পর তার রূহ মাটির দেহ ছেড়ে চলে যায়।

জাহহাক ইবনু কাইস ফিহরি রা. জানাজার নামাজ পড়ান। মুআবিয়া রা.-কে দামেশকেই দাফন করা হয়।
মুআবিয়া রা. বিশ বছর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর বিশ বছর খিলাফাতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
একটি বর্ণনা মোতাবেক বৃহস্পতিবার, ২২ রজব, ৬০ হিজরি মুআবিয়া রা.-এর ওফাত হয়।' অবশ্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বর্ণনামতে মৃত্যুর তারিখ ৪ রজব।

ইয়াযিদের প্রথম খুৎবা ও বায়াতের জন্য বার্তা প্রেরণ :

ইয়াযিদ রাষ্ট্রের সভাসদ এবং দামেশবাসীর উদ্দেশ্যে শোকবার্তা বক্তব্যে হামদ ও সানার পর বলেন, "মুয়াবিয়া রাঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন। তারপর নিজের কাছে নিয়ে গিছেন। তিনি পূর্ববর্তীদের থেকে মর্যাদার দিক থেকে কম হলেও পরবর্তীদের থেকে উত্তম ছিলেন। আমি তাকে আল্লাহর কাছে তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছি না। কেননা, আল্লাহ তাআলাই তার ব্যাপারে ভালো জানেন। যদি তার ক্ষমা হয়, তাহলে এটা আল্লাহর রহমাত। আর যদি পাকড়াও হন, তাহলে তা নিজের পদস্খলনের কারণে। তারপর যিম্মাদারী আমাকে দেয়া হয়েছে। কোন কিছুর অন্বেষণে আমি ব্যথিত নই এবং কোন কিছুর বর্জনে আমি

কৈফিয়ত দানকারী নই। কিন্তু যা আল্লাহ তাআলা মঞ্জুর করেন, তা'ই হয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৩, ইফাবা-৮/২৭২]
ইয়াযিদের এ খুতবা প্রমাণ করে, সে খলীফা হবার সময় প্রকাশ্য ফাসিক ছিল না। যা আমভাবে মনে করা হয়ে থাকে। বক্তৃতায়ও সে ছিল বেশ পারদর্শী।
দায়িত্বগ্রহণের পর ইয়াযিদ পুরো মুসলিম মিল্লাতের মাঝে হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকাল এবং নিজের খিলাফতের বাইয়াত গ্রহণের আহবান করে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৭]

এছাড়াও সে আমীরে মুয়াবিয়া রাঃ এর শেষ জমানায় কুফার গভর্ণর নু'মান বিন বশীর রাঃ, বসরায় উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এবং মদীনায় ওলীদ বিন উতবাকে স্বপদে বহাল রাখেন। নিঃসন্দেহে এটা তার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। [আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৪৬, ইফাবা-৮/২৭৭]

হযরত হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হননি কেন?

হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশায়ই হযরত হুসাইন রাঃ এবং তার সাথে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর অবস্থান এই ছিল যে, পৈত্রিক রাজত্ব পদ্ধতি পরিহার করে খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানার শুরায়ী নিজামে খলীফা নির্ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। আর এ দায়িত্ব উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ ও সেরা ব্যক্তিদের অধীনত হওয়া উচিত।

এ কারণেই তারা উভয়ে ইয়াযিদকে 'পরবর্তী খলীফা নির্ধারণ' বাইয়াত থেকে বিরত ছিলেন। তাদের উভয়ের ইয়াযিদের কাছে বাইয়াত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি 'রুখসত' তথা ছাড় দেয়া হিসেবে করার সুযোগ ছিল। কিন্তু 'আযীমত' বা দৃঢ়তা এটাই ছিল যে, পৈত্রিকসূত্রে খলীফা হবার এ পদ্ধতিকে বাতিল করার চেষ্টা করা, যাতে করে এ প্রচলনের হাত ধরে পরবর্তীতে বড় কোন ফিতনা তৈরী না হয়।
তারা উভয়ে আযীমতের উপর আমল করে প্রাথমিক পদ্ধতি হিসেবে ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। যাতে করে অন্যরাও ইসলামী রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচনের পূর্বের পদ্ধতির যথার্থতা অনুধাবনে সচেতন থাকেন।

হযরত হুসাইন রাঃ কি বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন?

হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুয়াবিয়া রাঃ এর জীবদ্দশা থেকেই কুফার পত্র আসছিল। যেন তিনি সেখানে চলে যান এবং উম্মতে মুসলিমার নেতৃত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন। [আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানীকৃত-৩/৭০]
কিন্তু এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা নেই, যাতে প্রমাণ হয় যে, হযরত হুসাইন রাঃ সেসব পত্রের জবাব দিয়েছেন বা তাদের আহবানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। বরং প্রাথমিক ঘটনাপ্রবাহ পরিস্কার জানায় যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার পরও হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। মদীনায়ই পুরো জীবন কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেই সাথে নিজের ফাতওয়া অনুপাতে বাইয়াত থেকেও বিরত থাকতে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু যখন ইয়াযিদের হাতে

বাইয়াত হতে তাকে চাপ সৃষ্টি করা হল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে মদীনা ছাড়লেন। কুফায় যাবার বিষয় নিয়েও ভাবতে শুরু করলেন।
[আনছাবুল আশরাফ-৩/১৫৫-১৫৬।

তাই বায়াত গ্রহণ না করা মানে হযরত হুসাইন রাঃ বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন এমনটি নয় । বরং প্রাথমিকভাবে হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর মানসিকতা এতোটুকুই ছিল যে, তারা ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবেন না ।
এমন কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে একথা বুঝা যায় যে, তারা ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছেন।

ইয়াযিদের রাজনৈতিক প্রথম ভুল

হযরত মুয়াবিয়া রা. ইয়াযিদকে নসিহত করেন 'নেতৃস্থানীয় মুরব্বীদের সাথে কঠোরতা করবে না। এবং তাদের উপর নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে জোরাজুরি করবে না'। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/২৫১-২৫২]

এই মূল্যবান ওসিয়ত ভুলে গিয়ে ইয়াযিদ মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যার ফলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে খারাপের দিকে মোড় নেয়।
ইয়াযিদের জন্য উচিত ছিল যে, যারা বাইয়াত হতে চাননি, সেসব নেতৃস্থানীয় বড় ব্যক্তিদের বিষয়ে নাক না গলানো। হযরত আলী রাঃ ও তার খিলাফতের জমানায় বাইয়াত হতে না চাওয়া নেতৃস্থানীয় কারো উপর চাপ সৃষ্টি করেননি। বাইয়াত না হবার কারণে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেননি। সম্মান প্রদর্শনে কোন কমতি করেননি।
ঠিক তেমনি হযরত মুয়াবিয়া রাঃ তার জমানায় যারা ইয়াযিদকে পরবর্তী খলীফা হিসেবে বাইয়াত হতে অস্বিকৃতি জানিয়েছেন, তাদের প্রতি বিরূপ ছিলেন না। তাদের সাথে কঠোরতা করেননি। বাইয়াত হতে বাধ্য করেননি ।কিন্তু ইয়াযিদ তার খিলাফাতের জমানায় প্রথম যে মারাত্মক ভুলটি করে, তাহলো সে মুরব্বী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে দ্রুত বাইয়াত গ্রহণে চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।
[আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৪৬-১৪৭, ইফাবা-৮/২৭৭-২৭৮)

বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবিক ইয়াযিদ সিংহাসনে আরোহণের পর হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইককে মদীনার গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার নিকট প্রেরণ করে। এই মর্মে হুকুম

দেয় যে, ওলীদ যেন হযরত হুসাইন রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ কে তরিৎ তার নিজের কাছে ডেকে আনে এবং তাদের থেকে বাইয়াত নেয়।
এই বার্তাবাহকই হযরতে মুয়াবিয়া রাঃ এর ইন্তেকালের সংবাদও নিয়ে যায়।
পত্রবাহক যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। সে অনেক চেষ্টা মেহনত করে গভর্ণর ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি পৌঁছায়। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২, আলইকদুল ফরীদ-৫/১২৫]

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের এবং হুসাইন রা: কেন মদীনা থেকে মক্কা রওনা দেন

মুয়াবিয়া রাঃ এর আযাদকৃত গোলাম রুযাইক থেকে সংবাদ পাওয়ার পর ওলীদ বিন উতবা সাথে সাথেই প্রথমে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এবং তারপর হযরত হুসাইন রাঃ কে গভর্ণর ভবনে তলব করে। বাইয়াত হবার জন্য অনুরোধ করে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ জবাবে বলেন,

"বাইয়াত হবার এটা কোন সময় নয়। তাছাড়া আমার মত ব্যক্তি একাকী লুকিয়ে বাইয়াত হবো না। আপনি কালকে মিম্বরে বসে আমার বাইয়াত গ্রহণ করুন"।

এরই মাঝে হযরত হুসাইন রাঃ উপস্থিত হলেন। ওলীদ বিন উতবা নরম স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর যুক্তিকে সঠিক মনে করে কালকে বাইয়াত হবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তখন হযরত হুসাইন রাঃ কে বাইয়াত হবার জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করলেন না। উভয়কে বাইয়াত ছাড়াই যাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তবে খবর রাখার জন্য সাথে কিছু লোককে পাঠালেন।

তারা উভয়ে বুঝে গেলেন যে, বাইয়াত না হলে তাদের উপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কঠোরতা করা হবে। তা'ই রাতের শেষ প্রহরে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ অপ্রসিদ্ধ একটি রাস্তা দিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২৩২]

ওলীদ যখন সকালে তার অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলো, তখন তার খোঁজে ৩০ বা ৮০ জন ঘোরসওয়ার প্রেরণ করল। কিন্তু তারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর টিকিটাও খুঁজে পেল না। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০০, বালাজুরীকৃত, তারীখে তাবারী-৫/৩৪১]

এক দুইদিন পর হযরত হুসাইন রাঃ তার পরিবারসহ মদীনা থেকে মক্কা রওনা হবার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪১]

ওলীদ বিন উতবাকে বরখাস্তকরণ

ওলীদ হযরত হুসাইন রাঃ এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ মক্কা রওনা হয়ে যাবার পর মাসআব বিন আব্দুর রহমান এবং আব্দুল্লাহ বিন মুতী' আলআদয়ী রাঃ কে গ্রেফতার করে জেলে বন্দী করলেন। যারা আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সমর্থক ছিলেন। মদীনাবাসী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর কাছে আবেদন করলেন যে, যেন প্রশাসন এভাবে কঠোরতা করা থেকে যেন বিরত থাকে। হযরত ইবনে উমর রাঃ পেরেশান হয়ে ওলীদ বিন উতবার সাথে সাক্ষাৎ করেন। বললেন, 'স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত রাখতে হকের উপর অটল থাকো, জুলুম করো না। যাদের গ্রেফতার করেছো তারা নির্দোষ। তাদের ছেড়ে দাও'।

ওলীদ বিন উতবা ওজরখাহী পেশ করল। আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের আদেশ এমনটাই। তাই লঙ্ঘণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মদীনাবাসী যখন দেখলো যে, আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ এর মত ব্যক্তিত্ব এর সুপারিশ পর্যন্ত ফিরিয়ে দেয়া হল। তখন তারা জেলখানায় হামলা করে বসে। এর ফলে আব্দুল্লাহ বিন মুতী' মুক্ত হয়ে মক্কায় চলে যান। আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর সাথে গিয়ে মিলে যান। [আনছাবুল আশরাফ-৫/৩০২]

হযরত হুসাইন রাঃ এবং ইবনে যুবায়ের রাঃ এর মদীনা থেকে বের হয়ে যাওয়ায় ইয়াযিদের চিন্তা বেড়ে যায়। উক্ত হযরতদ্বয়ের বাইয়াত নিতে অকৃতকার্য হবার সমস্ত দায়ভার ওলীদ বিন উতবার উপর চাপিয়ে তাকে বরখাস্ত করে দেন। তার স্থলে আমর বিন সাঈদ আললআশদাক কে নিয়োগদান করেন। যে কঠোর স্বভাবের অধিকারী বলে প্রসিদ্ধ ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৩] আমর বিন সাঈদ রমজানে মদীনা আগমন করে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৩]

এসেই ঘোষণা দেয় যে, সে যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছেন সেই স্থানে হামলা করবে। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২২৩] কিন্তু তার জন্য হামলা করার সুযোগ ছিল না। কারণ, শাওয়াল মাস নিকটবর্তী। হাজীদের কাফেলা মক্কায় আগমনের অপেক্ষমান। এমতাবস্থায় পবিত্র শহরে পবিত্র মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের উপর হামলা করা কিছুতেই বরদাশত করবে না। তাই ইচ্ছে থাকা সত্বেও আমর বিন সাঈদ হামলা থেকে বিরত থাকে। হচ্ছে মওসুম শেষ হওয়া এবং হাজীদের ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া ইয়াযিদ প্রশাসনের আর কোন উপায় ছিল না।

কেন নেতৃস্থানীয় ও মুরুব্বীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হোন

বিভিন্ন কারনে মানুষ ইয়াজিদের কাজে বায়াত হোন। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ হলো
:

- ❖ এক প্রকার দল যারা হযরত মুয়াবিয়া রাঃ এর দলীল ও ইজতিহাদের সাথে একমত ছিলেন।

- ❖ কেউ কেউ এই কথার উপর নির্ভর করে বায়াত হোন যে, বিভক্ত হওয়া যাবে না। কারণ কোরআন ও হাদিসে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে "একতা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখো। পরস্পর বিভক্ত হয়ো না"।তাই একতার এই গুরুত্বপূর্ণ হুকুমটি পালনের জন্য কিছু কিছু অবস্থায় নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুত্তম বস্তুকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই থেকে নেতৃস্থানীয় সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে উম্মতকে একতাবদ্ধ রাখতে ভূমিকা রাখেন।

- ❖ হামীদ বিন আব্দুর রহমানের এক বর্ণনায় এসেছে যে, ইয়াযিদ খলীফা হবার সময় তিনি একজন সাহাবীর কাছে গেলেন। তখন উক্ত সাহাবী বলেন, "তোমরা বল যে, ইয়াযিদ উম্মতের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি নয়, ইলম, ফাকাহাত এবং মর্যাদায় সবার চেয়ে উত্তমও নয়। আমিও একথাই বলি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি উম্মতে মুহাম্মাদীর একত্রিত থাকাকে তাদের বিভক্ত হয়ে যাওয়ার উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। [তারীখে খলীফা বিন খাইয়্যাত-২১৭]

- ❖ মুরব্বীশ্রেণীর ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হবার আরেকটি কারণ ছিল এই যে, সেসময় ইয়াযিদ বিষয়ে কোন খারাপ ধারণা কারো ছিল না। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, হাররার ঘটনা এবং কা'বা অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে তার চরিত্রে যে কালোদাগ অঙ্কিত হয় তাতো প্রকাশ পায় খলীফা হবার পর। কিন্তু খলীফা হবার আগে ইয়াযিদের চারিত্রিক কোন মারত্মক পদস্খলনও সংঘটিত হয়নি। এছাড়াও সে ছিল পরীক্ষিত সেনানায়ক। হজ্জের প্রধান ইমামের দায়িত্বপালনকারী। একজন সাহাবীর সন্তান। নেক ও মুত্তাকী পরিবারের সন্তান। এইসব গুণাবলীর দিকে তাকিয়ে অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ভালো কিছুই হবে সেই আশায় তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

- ❖ আবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস রয়েছে-

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ " اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا ، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِي كَأَنَّ رَأْسَهُ زبيبة"

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা শোন ও আনুগত্য প্রকাশ কর, যদিও তোমাদের উপর এমন কোন হাবশীকে আমীর নিযুক্ত করা হয় যার মাথা কিসমিসের মতো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৬৯৩, ইফাবা-৬৬০]

এ হাদীসের আলোকে বুঝা যায় যে, যখন কোন খলীফা যেভাবেই হোক যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে তাকে মেনে নেয়া উচিত। তার বিরোধীতা করা যাবে না। যদিও সে দেখতে কুৎসিত হয় না কেন। উক্ত হাদীসের উপর আমল হিসেবেও অনেক সাহাবা ও তাবেয়ীগণ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হওয়াকেই নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বাস্তবায়ন মনে করেছেন। তাই তার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

হযরত হুসাইন রাঃ মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সে সময় আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ এর কাছে ইয়াযিদ একটি পত্র প্রেরণ করে। যার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সে হুসাইন রাঃ এর কার্যক্রম বিষয়ে নজর রাখছিল। তার থেকে বিদ্রোহের আশংকা করছিল। তাই পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে কড়া হুশিয়ারী প্রদান করে।

পত্রে ইয়াযিদ লিখে যে,

"হুসাইন রাঃ এর নিকট পূর্ব থেকে লোকজন এসে তাকে খেলাফতের আশা দিচ্ছে। আপনি অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত অভিজ্ঞ মানুষ। যদি হুসাইন রাঃ এমন করেন, তাহলে আত্মীয়তার বন্ধন ছিড়ে যাবে। আপনি বংশের বড় এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আপনি তাকে এ বিদ্রোহ থেকে বাঁধা প্রদান করুন।"

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ উত্তরে লিখলেন,

"আমার প্রত্যাশা যে, হুসাইন রাঃ এর গমণ এমন কোন কাজের জন্য হবে না, যা আপনার জন্য অসন্তুষ্টির কারণ হবে। [তারীখে দামেশক-৪/২১০]

মোটকথা, দামেশক প্রশাসনের কাছে হুসাইন রাঃ এর বিষয়টি খুবই গুরুত্ববহ ছিল। হুসাইন রাঃ এর যোগাযোগ কুফার জনগণের সাথে হওয়ায় ইয়াযিদের ভয় হয় যে, তারা সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করে বসবে। এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ভাবলেন যে, ইয়াযিদ ও তার নির্ধারিত

গভর্ণরেরা হুসাইন রাঃ এর অবস্থান সম্পর্কে না বুঝেই বিদ্রোহ মনে করে তাদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হতে পারে।
কারণ, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তাকে হত্যা করার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-
হযরত আরফাজাহ রাঃ থেকে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ

মুসলিমগণ ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তি তাদের কাজে বাধা দিবে সে যে-ই হোক, তোমরা তাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করো। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৭৬২, সহীহ মুসলিম ।
সে যেই হোক না কেন, যদি সে মুসলমানদের একতার মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করতে আসে, তাহলে তাকে হত্যা করতে বলা হয়েছে।
যদিও হযরত হুসাইন রাঃ এর দৃষ্টিতে ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। এখনো তার অধীনে উম্মত একতাবদ্ধ হয়নি বলেই প্রতিয়মান হয়েছিল। তাই ইয়াযিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে তিনি একতা বিনষ্টের কারণ হিসেবে গণ্য করেননি। কিন্তু ইয়াযিদ ও তার প্রশাসনের দৃষ্টিতে তা ছিল রাষ্ট্রদ্রোহিতা। তাই তারা যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে হযরত হুসাইন রাঃ আশংকা করলেন। এ কারণে, সরাসরি ইয়াযিদের সাথে কথা না বলে আগে কুফা গমণ করে নিজেদের শক্তিমত্তা মজবুত করার পর বিষয়টির সূরাহা করতে চেয়েছিলেন।

হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার শিয়াদের পত্র

কুফাবাসী শিয়ারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। শিয়াদের প্রকাশিত শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস এর মাঝে আসছেঃ-
"আর কুফার জনগণের বিষয়ে, যখন তারা মুয়াবিয়ার মৃত্যু সংবাদ পেলো তারা ইয়াযিদ সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে শুরু করল। এছাড়া তারা জানতে পেরেছিল যে, ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ করতে অস্বিকার করেছেন এবং মক্কায় চলে গিয়েছেন। আর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরও মক্কায় পালিয়ে গেছে তার সাথে এবং তার সাথে এবং তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

ইমামের শিয়ারা (অনুসারীরা) সুলাইমান বিন সুরাদ খুযাইর বাড়িতে জড়ো হয় মুয়াবিয়ার মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করতে এবং আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ করতে। সুলাইমান উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'মুয়াবিয়ার মৃত্যু হয়েছে এবং ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকার করেছেন ও মক্কায় চলে গিয়েছেন। তোমরা তার ও তার বাবার শিয়া

(অনুসারী)। তাই যদি তোমরা তাকে সাহায্য কতে চাও ও তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে চাও তাকে চিঠি লিখো এবং তাকে এ বিষয়ে জানাও। কিন্তু যদি তোমরা ভয় পাও যে তোমরা ঢিলেমী করবে এবং পিছু হটবে তাহলে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না (তাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়ে)।' প্রত্যেকেই ঐক্যবদ্ধভাবে শপথ করলো যে, তারা তাকে সাহায্য করবে এবং তার শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তার আদেশে এবং তাদের জীবনকে এগিয়ে দিবে কুরবান করতে। যখন সুলাইমান তা শুনলেন, তিনি তাদেরকে আহবান জানালেন ইমামকে চিঠি লেখার জন্য এবং তারা লিখলো।

এরপর তারা অসংখ্য চিঠি হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে প্রেরণ করে। যার মূল বক্তব্য ছিল- পুরো ইরাক ইয়াযিদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। শুধু কুফার মাঝেই এক লাখ অস্ত্রধারী লোক হুসাইন রাঃ এর সহযোগিতায় প্রস্তুত। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯১]

শুধু তা'ই নয়, স্থানীয়রা ইয়াযিদ নির্ধারিত কুফার গভর্ণর নু'মান বিন বশীর রাঃ এ পিছনে জুমআর নামায পড়াও ছেড়ে দিয়েছে। লোকেরা হুসাইন রাঃ এর অনুরক্ত এবং তাকে ছাড়া কারো উপর ভরসা করছে না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৭]
এরকম অসংখ্য পত্র লিখে হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আসার জন্য প্রলুব্ধ করছিল শিয়ারা।শুধুমাত্র চিঠি পাঠিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি কুফাবাসী। পরপর চিঠির সাথে সাথে প্রতিনিধিদলও প্রেরণ করছিল হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় আগমনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যেমন শিয়াদের লিখিত বইয়ের মাঝে এসেছে-

"তারা এ চিঠি দিলো উবায়দুল্লাহ বিন মুসমে হামাদানী এবং আব্দুল্লাহ বিন ওয়াল তাইমিকে এবং তাদেরকে দ্রুত যেতে বলল। তারা দ্রুত গেলো যতক্ষণ না তারা দশই রমযান মক্কাতে পৌঁছালো। এরপর কুফার লোকেরা দুদিন অপেক্ষা করলো এবং কায়েস বিন মুসাহহার সাইদাউই এবং আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ আরহাবি এবং আম্মারাহ বিন আব্দুল্লাহ সালুলিকে আবার পাঠালো একশত পঞ্চাশটি চিঠি দিয়ে যা এক, দুই, তিন অথবা চারজন লিখেছিলো।

এরপর আবার দু'দিন পর তারা হানি বিন হানি সাবেঈ এবং সাঈদ বিন আব্দুব্দুল্লাহ হানাফিকে দিয়ে একটি চিঠি পাঠালো যার বিষয়বস্তু ছিল এরকম: 'আল্লাহর নামে যিনি সর্ব দয়ালু, সর্ব করুণাময়। হোসেইন বিন আলী (আ.) এর প্রতি তার অনুসারীদের, বিশ্বাসীদের এবং মুসলমানদের পক্ষ থেকে। আম্মা বা'আদ, লোকজন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আর কোন মত পোষণ করবেন না, তাই দ্রুত আসুন, দ্রুত আসুন। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক'।

আরেকটি চিঠি লিখেছিলো শাবাস বিন রাবঈ, হাজ্জার বিন আবজার আজালি, ইয়াযিদ বিন হুরেইস বিন রুয়েইম শাইবানি, উরওয়া বিন কায়েস আহমাসি, আমর বিন হাজ্জার যুবাইদি এবং মুহাম্মদ বিন আমর তামিমি, যার বিষয় ছিলো এরকম: 'আম্মা বাআদ, বাগানগুলো সবুজ রং ধারণ করেছে এবং ফলগুলো পেকেছে। যদি আপনি চান, এখানে আসতে পারেন, সেনাদল আপনাকে রক্ষায় প্রস্তুত'।" [শিয়াদের লিখিত 'শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১ম, পৃষ্ঠা-৬২]

উপরোক্ত পত্রাবালীর বিবরণ এবং প্রতিনিধিদলের বক্তব্য জানাচ্ছিল যে, হুসাইন রাঃ দ্রুত ইরাক এসে পরিস্থিতি শামাল না দিলে পুরো ইরাকে ব্যাপক হত্যাকা- শুরু হয়ে যাবে। কারণ, এখানকার অপরিপক্ক বুদ্ধির অধিকারীরা অধৈর্য হয়ে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে। ফলে রক্তের বন্যা বইবে পুরো ইরাক জোরে।
হযরত হুসাইন রাঃ স্বীয় পিতার মত চিন্তা করলেন যে, গোঁয়ার টাইপের মুর্খ লোকদের দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের কাছে টেনে বুঝিয়ে সমঝিয়ে হক পথে রাখাটাই অধিক উপযোগী। যারা পাগলপাড়া হয়ে তাকে কাছে ডাকছে। তাদের নেতৃত্ব দেবার জন্য উদাত্ব আহবান করছে।

যদি তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে নিজের কম বুদ্ধির কারণে অনর্থক রক্তক্ষয়ী কোন সংঘর্ষের জন্ম দিতে পারে।

তাই তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদেরকে একতাবদ্ধ করে কম ক্ষতির মাধ্যমে উদ্দেশ্য হাসিল করা সম্ভপর হবে বলে আশা করা যায়।

এ কারণেই তিনি বিপদকে মাথায় তুলে নিয়ে ইরাকে যাওয়াই উপযোগী মনে করলেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, ইরাকে আসলে, সেখানকার জনগণকে নিয়ে তার নেতৃত্বে একটি নতুন শক্তির উত্থান হবে। একদিকে ইরাকের বিশাল জনগোষ্ঠি অপরদিকে হেযাজে আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর নেতৃত্বে জনসাধারণের বিরাট জামাত। দুইদিক থেকেই বিশাল জনতার একতবদ্ধ অবস্থান দেখে ঘাবরে গিয়ে ইয়াযিদ প্রশাসন হয়তো তাদের রাষ্ট্রনীতির পদ্ধতি পরিবর্তন করে খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকায় রাষ্ট্র পরিচালনা পদ্ধতিতে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। তাহলে কোন প্রকার রক্তপাত ছাড়াই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে।

আর যদি ইয়াযিদ প্রশাসন তা না মানে, তবুও এ সম্মিলিত শক্তি কম ক্ষতির সম্মুখিন হয়েই ইয়াযিদ বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করে ফেলবে। ফলে অল্প ক্ষতির মাধ্যমে বড় উপকার অর্জিত হবে বলে দৃঢ় আশা করা যায়।

কুফাতে মুসলিম বিন আকীল

কুফাবাসীর এতো পত্র, এতো আহবানের পরও হযরত হুসাইন রাঃ তাড়াহুড়া করেননি। ইরাকী লোকদের পত্র ও প্রতিনিধিদলের বক্তব্য পুরাপুরি বিশ্বাস করেননি। বরং সত্যাসত্যি যাচাই করার জন্য তিনি তার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকীলকে প্রেরণ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে সরেজমিন জানতে চান। তাই কুফীদের কথার উপর ভরসা করে নিজে প্রথমে না গিয়ে মুসলিম বিন আকীলকে পাঠানোকে নিরাপদ মনে করলেন।
শিয়া রাবী আবু মিখনাফ এর বর্ণনা হল, হুসাইন মুসলিম বিন আকীলের মাধ্যমে কুফাবাসীর কাছে এ পয়গাম পাঠান যে, 'হুসাইন বিন আলীর পক্ষ থেকে আহলে ঈমান ও মুসলমানদের প্রতি। হানী এবং সাঈদ আপনাদের পত্র আমার কাছে এনেছে। আপনাদের দূতদের মাঝে এ দুইজন সবার শেষে আসছে। যা কিছু হযরতরা লিখছেন যে, "আমাদের নেতৃত্ব দেবার কেউ নাই। আপনি আসুন। হয়তো আপনার মাধ্যমে হক ও হিদায়াতের আল্লাহ তাআলা আমাদের একত্র করে দিবেন"। এসব জেনে আমি আমার চাচাতো ভাই। যার উপর আমার আস্থা আছে। আর তিনি আমার পরিবারেরও অন্তর্ভুক্ত। তাকে আপনাদের কাছে পাঠালাম। আমি তাকে বলেছি যে, তিনি যেন আপনাদের অবস্থা এবং সবার রায় আমাকে পত্র লিখে পাঠায়। যদি তার পত্র দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আপনাদের দলের সংখ্যা এবং আপনাদের জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা একথার উপর একমত, যে বিষয়ে আপনারা আমার কাছে পত্র লিখছেন এবং আমার কাছে দূত পাঠিয়েছেন। তাহলে খুব দ্রুতই আমি আপনাদের কাছে আসবো ইনশাআল্লাহ। [তারীখে তাবারী-৫/৩৫৩] এ আখেরী পত্র দ্বারাও বুঝা যায় যে, হযরত হুসাইন রাঃ কোন যুদ্ধ করতে চাননি। কেবল কুফাবাসীর একতা ও সমর্থন চেয়েছেন।

হযরত মুসলিম বিন আকীল কুফায় আসলেন। কুফীরা বিশাল শো ডাউনের মাধ্যমে তাকে বরণ করেন। মুসলিম বিন আকীলের হাতে অল্প কয়েক দিনে প্রায় আঠারো হাজার লোক হুসাইন রাঃ এর নামে বাইয়াত হয়।
যাতে করে মুসলিম বিন আকীল বুঝেন যে, কুফীরা পত্রে যা লিখেছে এবং লোক পাঠিয়ে যা কিছু বলছে, এ সব কিছুই সত্য। তারা হযরত হুসাইন রাঃ এর জন্য জান দিতে প্রস্তুত। আর কুফায় এখানো ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পায়নি। অধিকাংশ লোক ইয়াযিদের খেলাফতের বিরোধী। কিন্তু আসলে এসবই ছিল তাদের প্রতারণা। তাদের মূল মাকসাদ ছিল যেন হযরতে হুসাইন রাঃ কুফায় আসেন। আর তারা তাদের মাকসাদ যা করতে পারে।

কুফায় তখন ইয়াযিদের খেলাফত মজবুত হয়ে গিয়েছিল। কুফায় তখন ইয়াযিদের গভর্নর ছিল হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ। তিনি মুসলিম বিন আকীলের আগমণ এবং বাইয়াত সম্পর্কিত বিষয় জানার পরও কোন এ্যাকশনে যাননি।

এতে কেউ কেউ আপত্তি তুললে নুমান বিন বাশীর রাঃ বলেন, আল্লাহর আনুগত্যে থেকে দুর্বল থাকা আমার পছন্দ, আল্লাহর নাফরমানীতে শক্তিশালী হবার চেয়ে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮] তিনি মুসলিম বিন আকীলের সাথীদের বলেন, 'আমি সন্দেহের বশে তোমাদের গ্রেফতার করবো না। তবে যদি একথা জানতে পারি যে, তোমরা খলীফার বাইয়াত ভেঙ্গেছো, এবং রাষ্ট্রদ্রোহ করছো, তাহলে আল্লাহর কসম! আমি তলোয়ার ব্যবহার কতে কুণ্ঠিত হবো না'। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]

একজন গভর্নর হিসেবে নুমান বিন বশীর রাঃ নিশ্চয় মুসলিম বিন আকীলের যাবতীয় কার্যক্রম নজরে রাখছিলেন। কিন্তু তারপরও মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার না করা একথাই প্রমাণ করে যে, হযরত নুমান বিন বশীর রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের কার্যক্রমকে রাষ্ট্রদ্রোহ বলে মনে হয়নি। যদি এমন কিছু হতো, তাহলে তিনি অবশ্যই এ্যাকশনে যেতেন।

হযরত হোসাইন রা. এর কাছে আশ্বাসমূলক পত্র প্রেরণ

মুসলিম বিন আকীল কুফাবাসীর প্রতারণা বুঝতে না পেরে তাদের বাহ্যিক উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনা ও সহযোগিতা দেখে খুশি খুশি পত্র প্রেরণ করেন হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে। যাতে তিনি জানান যে, বার হাজার লোক আমার হাতে বাইয়াত হয়ে গেছে। প্রচুর লোক বাইয়াত হতে আসছে। আপনি দ্রুত কুফায় চলে আসুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৪৮]

এক বর্ণনায় আসছে যে, তিনি লিখেন: সমস্ত কুফাবাসী আপনার সাথে আছে। আপনি আমার চিঠি পেতেই চলে আসুন। [আনছাবুল আশরাফ বালাজুরীকৃত-৩/১৬৭]
এ পত্র ৬০ হিজরীর জিলকদ মাসের এগার তারিখে পাঠানো হয়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১, ৫/৩৯৫]

হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফা যেতে কে কিভাবে বাধা দিয়েছিলো

হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে মুসলিম বিন আকীলের পত্র আসতেই তিনি কুফায় রওনার প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। এ সফরে তাঁর পরিবারের অল্প কিছু ব্যক্তি ছাড়া আর কোন মুসলমান এটিকে সমর্থন করেননি। বরঞ্চ বরং বড় সাহাবাগণ এবং তাঁর নিকটাত্মীয়গণ যথাসম্ভব কুফায় যেতে বারণ করতে থাকেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ খুব বুঝালেন যে, মক্কার বাইরে যাবেন না। কুফায় যাবার ইচ্ছে পরিত্যাগ করুন। এটাকে একটা ষড়যন্ত্র মনে হয়। যেভাবে আপনার পিতা আলী রাঃ কে ওরা হত্যা করেছে কুফাবাসী। ওরা আপনার বাবা ও ভাই হাসান রাঃ এর সাথে গাদ্দারী করেছে ওরা। এমনিভাবে আপনার সাথেও এরা গাদ্দারী করবে। তারা উভয়ে খুব বুঝালেন। যেভাবে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গনী রাঃ কে তার পরিবারের সামনে হত্যা করা হয়েছে। না জানি ওরাও আপনাকে আপনার পরিবারের সামনেই হত্যা করে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩০৩]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাঃ একথা বলতে থাকেন যে, যদি আমি বুঝতাম যে, আমি বাঁধা দিলে তুমি যাবে না, তাহলে আমি তোমার মাথা ও দাড়ি ধরে বাঁধা দিতাম।

তারপর হযরত ইবনে আব্বাস রাঃ দৌড়াতে দৌড়াতে হযরত হুসাইন রাঃ এর ঘোড়ার লাগাম ধরে বললেন, যদি আপনি যেতেই চান, তাহলে অন্তত সন্তান সন্তুতি এবং পরিবারের সদস্যদের রেখে যান। তাদের এ বিপদের মুখে নিয়ে যাবেন না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৪-১৬৫, এরাবিক, ৮/৩০১-২, বাংলা, তারীখে তাবারী-৩৮৩-৩৮৪]
হুসাইন রাঃ এর ভাই মুহাম্মদ বিন আলী হানফিয়্যাহ ও সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন ভাইকে সফরে বাঁধা দিতে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৫, আরবী, ৮/৩১১-৩১২, বাংলা]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ হযরত হুসাইন রাঃ কে বুঝাতে বলেন,

اتق الله في نفسك، وألزم بيتك، ولا تخرج على امامك

আল্লাহকে ভয় কর। নিজের ঘরে বসে থাকো। নিজের ইমাম ইয়াযিদের বিরুদ্ধে যেও না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৩]

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাঃ বলেন,

كلمت حسينا، فقلت له اتق الله، ولا تضرب الناس بعضهم ببعض

আমি হুসাইন রাঃ কে এ বিষয়ে কথা বলে বললাম, তুমি আল্লাহকে ভয় কর। লোকদের পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত করিও না। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬৩]
হুসাইন রাঃ এর চাচাতো ভাই এবং বোন জামাতা হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর রাঃ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন হযরত হুসাইন রাঃ কে কুফায় যেতে বাঁধা দিতে। কিন্তু তার কথাও তিনি মানলেন না। [তারীখে তাবারী- ৫/৩৮৭-৩৮৮]

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ এর বাঁধা প্রদান

قَالَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِلْحُسَيْنِ: أَيْنَ تَذْهَبُ إِلَى قَوْمٍ قَتَلُوا أَبَاكَ وَطَعَنُوا أَخَاكَ؟ فَقَالَ: لِأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ

كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُسْتَحَلَّ بِي يَعْنِي مَكَّةَ

আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের রাঃ হুসাইন রাঃ কে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছো, তুমি কি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছো, যারা তোমার পিতাকে হত্যা করেছে আর তোমার ভাইকে অপবাদ দিয়েছে। তখন তিনি বললেন, অমুক কিংবা তমুক স্থানে নিহত হওয়া আমার কাছে আমার কারণে মক্কা হালাল (হত্যা বৈধস্থান) হওয়া থেকে উত্তম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৬১, আরবী, ৮/৩০৪ ইফাবা]

এই সকল আত্মীয় স্বজন, কিবারে সাহাবাগণ সকলেই হযরতে হুসাইন রাঃ কে কখনো কোমল সুরে, কেঁদে কেঁদে, কখনো কঠোরতার সাথে বাঁধা দেবার চেষ্টা করেন। কুফার লোকেরা ধোঁকাবাজ। এরা প্রতারক। ওদের চিঠির বক্তব্য আর বাস্তবতা এক নয়। তাই সেখানে যাওয়া নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া। তাছাড় ইয়াযিদের খেলাফত পূর্ণতা পেয়েছে। সুতরাং এখন ভিন্ন কিছু চিন্তা করা মানে রাষ্ট্রদ্রোহীতা হবে। তাই সেখানে যাওয়া কিছুতেই উচিত হবে না।

কিন্তু হুসাইন বিন আলী রাঃ নিচের সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। পরিবারসহ তিনি প্রসিদ্ধ কওল অনুপাতে জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ মক্কা থেকে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন। তবে রাজেহ কওল হল, হযরত হুসাইন রাঃ এর আগেই রওনা হন। [তারীখে উম্মতে মুসলিমাহ, ইসমাঈল রেহানকৃত-২/৪৭৬]
সঙ্গী ছিলেন পরিবারের ৮২ সদস্য এবং কুফার ৬০ জন শিয়া। তিনি যাবার সময় সাথে কুফাবাসী শিয়াদের লিখিত পত্রও নিয়ে নেন। [তারীখে দামেশক-৪/২০২]
মক্কা থেকে কারবালার দূরত্ব ত্রিশ মনজিল। সেই জমানায় মনজিল ছাড়া এদিক সেদিক বিরতি দেয়া হতো না। সেই হিসেবে কাফেলা প্রতিদিন এক মনজিল সফর করতো। এভাবে সফর করে দশে মুহাররমে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যান।

হযরত হুসাইন রাঃ এতো বাঁধার পরও কেন থামলেন না?

এতো বড় বড় ব্যক্তিত্ব, মুখলিস স্বজন ও প্রিয়জনদের এতো বাঁধার পরও কেন হযরতে হুসাইন রাঃ নিজের সিদ্ধান্তে অটল রইলেন? তিনি কি ক্ষমতার লোভী ছিলেন? নাউজুবিল্লাহ!

অবশ্যই নয়। তিনি একথা বুঝতে পারছিলেন যে, কুফা যাওয়া ছাড়া এ সমস্যার সমাধান হবে না।

দ্বিতীয়ত মক্কার গভর্ণরের পক্ষ থেকে এ শংকা ছিল যে, সুযোগ পেলেই জোরপূর্বক বাইয়াত গ্রহণ করাতে চাইবে ইয়াযিদের নামে। বাইয়াত নিতে চাইলে যে মতানৈক্য তৈরী হবে এতে করে পবিত্র শহরে রক্তপাতের সম্ভাবনা আছে। তবে অন্যান্য সাথীদের কথামত বাইয়াত নিয়ে ঘরে থাকলে অবশ্যই নিরাপত্তা পাওয়া যেতো। শরীয়তে এর সুযোগও ছিল।

কিন্তু তার মত ব্যক্তিত্বের জন্য হাত গুটিয়ে বসে থাকা শোভা পায়নি। তাই তার কাছে ইজতিহাদ অনুপাতে দৃঢ়তার উপর অটল থাকাকে যথার্থ বলে মনে হয়েছে। যাতে করে ইসলামী হুকুমতের উপর এক খান্দানের প্রতিপত্তির রেওয়াজ বন্ধ হয়। এ কারণেই তিনি শত বাঁধা বিপত্তির পরও নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে কুফা যাবার পক্ষেই অনড় থাকেন।

নুমান বিন বশীরকে বরখাস্ত

মুসলিম বিন আকীলের পত্র পৌঁছতে তিন চার সপ্তাহ লেগেছে। এর মাঝে কুফার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। যে ব্যাপারে হযরত হুসাইন রাঃ কিছুই জানতেন না। ঘটনা হল, কুফার কঠোরমনস্ক লোকেরা গভর্ণর মুসলিম বিন আকীল বিষয়ে নুমান বিন বশীর রাঃ এর কোমল আচরণ পছন্দ করছিল না। প্রথমে তাকে নানা কথা বলে ক্ষুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নুমান বিন বশীরের অবিচলতা থেকে তারা ইয়াযিদের কাছে এ বিষয়ে নালিশ দিয়ে চিঠি পাঠায়। আজগুবি ও বানোয়াট কথা মিশ্রিত পত্রে ইয়াযিদকে ক্ষিপ্ত করা। যাতে করে তিনি নুমানকে বরখাস্ত করেন।

প্রথম পত্রটি পাঠায় এক খৃষ্টান। যার ব্যাপারে ইয়াযিদ ছিল বেখবর। ইয়াযিদ ওদের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে নুমান বিন বশীরের মত বয়োজেষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে দেয়। বসরার গভর্ণর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বসরার সাথে কুফার নতুন গভর্ণর হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করে।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ছিল কঠোর হৃদয়ের অধিকারী এবং দায়িত্ব পালনে ছিল কট্টর। উবায়দুল্লাহ দায়িত্ব পেতেই বসরা থেকে কুফায় চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিন আকীল শহরের এক সরকারী আমীর হানী বিন উরওয়াহ এর ঘরে ছিলেন। উবায়দুল্লাহ গোয়েন্দা মারফত এ সংবাদ জানতেই হানী বিন উরওয়াহকে ডেকে পাঠান।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি মুসলিম বিন আকীল কোথায় তা বলতে অস্বিকৃতি জানান। এতে উবায়দুল্লাহ ক্ষীপ্ত হয়ে তাকে জেলে বন্দী করেন।

প্রতারণা ও মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা

হানী বিন উরওয়াহে জেলে বন্দীর খবর শুনে মুসলিম বিন আকীল তার মেজবান হানী বিন উরওয়াহকে জেল থেকে উদ্ধার করতে অস্ত্রসহ চার হাজার লোক নিয়ে ময়দানে নেমে আসেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯১, ৫/৩৪৯-৩৫০, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৫৪, ৮/২৯২ বাংলা]

যা ছিলো একটি মারাত্মক ভুল। যখন এ বিশাল বাহিনী নিয়ে গভর্ণরী ভবনের দিকে রওনা হন তখন শুরুতে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু দ্রুতই কুফার পুরানো প্রতারণার অভ্যাস প্রকাশ পেয়ে যায়। মুসলিম বিন আকীল যখন আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন একে একে তার সাথে শরীক কুফী শিয়ারা সটকে পড়তে শুরু করে।

মা তার ছেলের কাছে, বোন তার ভাইয়ের কাছে এসে বলতে লাগল, বাড়িতে ফিরে চল। লোকেরা তোমাদের বাঁধা দিবে। তদ্রুপ পিতা পুত্রকে এবং ভাই ভাইকে বলতে লাগল, কাল যখন শামের ফৌজ এসে পৌঁছবে তখন তুমি কিভাবে তাদের হাত থেকে নিস্তার পাবে? তখন লোকেরা মুসলিম বিন আকীলকে অসহায় অবস্থায় রেখে একে একে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে পড়ল এবং দেখা গেল তাঁর সাথে পাঁচশ যোদ্ধা বাকি আছে।

এরপর তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে তিনশ" তারপর ত্রিশে দাঁড়াল। তিনি তাদেরকে নিয়ে মাগরিব নামায পড়লেন এবং আবওয়াবে কিন্দা অভিমুখী হলেন। আর সেখান থেকে দশজন নিয়ে বের হলেন। তারপর এরাও সটকে পড়ল। তখন তিনি সম্পূর্ণ একাকী হয়ে পড়লেন। তাঁর সাথে না থাকলো পথ দেখানোর মত কেউ, কিংবা অন্তরঙ্গতা দান করার মত কেউ, কিংবা নিজ গৃহে আশ্রয় দান করার মত কেউ।

তখন তিনি অজানা গন্তব্যের পথে বেরিয়ে পড়লেন। আর এদিকে অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আসছিল। আর তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে একাকী রাস্তায় পথ চলছিলেন। এভাবে তিনি এক গৃহদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। করাঘাত করলে ত্বওয়া নামক এক স্ত্রীলোক বের হল, আর সে ছিল আল আশআছ বিন কায়েশের ঐরষে সন্তান জন্মদানকারিণী বাঁদী। তিনি পানি চাইলেন। পানি পান করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে আল্লাহর বান্দী! এই শহরে আমার কোন বাড়ি ঘর কিংবা স্বজন পরিজন কেউ নেই। তোমার কি আমার প্রতি একটু সদাচার ও অনুগ্রহ করার সুযোগ আছে? যার পুরস্কার আমি পরে তোমাকে দিবো। কুফার লোকেরা আমাকে ধোঁকা দিয়েছে। আমার সাথে মিথ্যা বলেছে। তখন উক্ত বাঁদী নিজ গৃহে মুসলিমকে আশ্রয় দেন। নিরাপদ ঘরে থাকতে দেন।

ত্বওয়ার ছেলে এসে যখন বিষয়টি জানল। তখন পরদিন সকালে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ পর্যন্ত এ খবর জানিয়ে দিল। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ মুসলিম বিন আকীলকে পাকরাও করে নির্মমভাবে হত্যা করে লাশ ছাদ থেকে ফেলে দেয়। হানী বিন উরওয়াকেও হত্যা করে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৫৫-১৫৭, আরবী, ৮/৩৯৩-৩৯৭, বাংলা, তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, ৫/৩৫০)

উবাইদুল্লাহর কাছে হুসাইন রাঃ এর রওনার সংবাদ

হেযাজের গভর্ণর আমর বিন সাঈদ হযরত হুসাইন রাঃ এর রওনা হতেই দারুল খিলাফাহ দামেশকে ও কুফায় সংবাদ দিয়ে লোক পাঠিয়ে দেন। তিনি উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে লেখেন যে, হুসাইন রাঃ তোমার দিকে আসছে। [তারীখে দামেশক-৪/২১২]
মারওয়ান বিন হাকামও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে এ সংবাদ পাঠান। তবে সাথে সাথে পত্রযুগে লিখে পাঠান যে, হুসাইন রাঃ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেয়ে ফাতিমা রাঃ এর ছেলে। আল্লাহর কসম! আমাদের কাছে হুসাইন রাঃ এর চেয়ে প্রিয় কেউ নাই। খবরদার! জোশের বশে এমন কিছু করে বসো না, যে কাজের কোন ক্ষতিপূরণ করা না যায়। আর লোকদের তা ভুলানো না যায়। [তারীখে দামেশক-৪/২১২]
মারওয়ান বিন হাকামের উক্ত পত্র দ্বারা বুঝা যায় যে, বনু উমাইয়ার জ্ঞানী গুণী ও লোকেরা হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্মান ও ইজ্জত করতো। কিন্তু আফসোস হল, উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ এসব জ্ঞানী ও সমঝদার ব্যক্তিদের পরামর্শ কানে নেয়নি। বড়দের সম্মান করা তার আদতের মাঝেই ছিল না। সে ছিল সৈনিকের ছাঁচে গড়া এক যন্ত্রমানব। মারওয়ানের মত বয়োজেষ্ঠ্য উময়ী আমীরের কথার কোন গুরুত্বও তার কাছে ছিল না।

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রতি ইয়াযিদের পত্র

সে সময় ইয়াযিদ উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠায়। তাতে লিখে যে, আমার কাছে সংবাদ এসেছে যে, হুসাইন রাঃ কুফার দিকে আসছেন। হুসাইন রাঃ এর বিষয়ে সব সময়ের মাঝে তোমার সময়টা, সকল শহরের মাঝে তোমার শহর, সকল গভর্ণরদের মাঝে তুমিই বড় পরীক্ষার সম্মুখীন। এমন পরীক্ষা পতিত হয়েই লোকেরা উন্নতী অর্জন করে অথবা গোলামদের মত লাঞ্ছিত হয়ে যায়। [আলমু'জামুল কাবীর-৩/১১৫]
মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করায় শাবাশী দিয়ে ইয়াযিদ লিখেন:

গোয়েন্দা এবং সশস্ত্র পাহারাদারদের সতর্ক রাখো। যাদেরই সন্দেহ হয় গ্রেফতার করো। যাদের উপর অভিযোগ আছে তাদের পাকড়াও করো। কিন্তু হত্যা কেবল তাকেই করবে, যে তোমার সাথে যুদ্ধ করে। আর আমাকে ঘটমান সকল কিছু জানাতে থাকবে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮১]

ইয়াযিদের উক্ত পত্র প্রমাণ করে যে, ইয়াযিদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাফেলায় স্বপ্রণোদিত হয়ে কোন প্রকার ধর-পাকড় করতে আদেশ দেননি। বরং যদি অভিযোগ পাওয়া যায়, বা সন্দেহযুক্ত কাজ করে তাহলেই কেবল পাকড়াও করবে। আর তারা যুদ্ধ না করলে তাদের সাথে হত্যার মত কাজ না করতেও নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইয়াযিদ হয়তো ইবনে যিয়াদকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করেছে। অথচ ইবনে যিয়াদের মত পাথর দিলের মানুষের জন্য এতটুকু বলা যথার্থ ছিল না। ইয়াযিদের উচিত ছিল একথা জানানো যে, যদি খারাপ কিছুর সম্ভাবনা হয়, তাহলে যেন হযরত হুসাইন রাঃ কে নিরাপত্তার সাথে তার কাছে দামেশকে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু এভাবে স্পষ্ট কিছু না বলা ইয়াযিদের অপূরণীয় ভুল বলেই প্রতীয়মান হয়েছে।

মুসলিম বিন আকিলের অবস্থা না জানাতে কি করা হয়েছিলো

মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা পর উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের প্রথম প্রচেষ্টা এই ছিল যে, কুফার অবস্থা সম্পর্কে হযরত হুসাইন রাঃ কে সম্পূর্ণ বেখবর রাখা। এ লক্ষ্যে সে কুফা থেকে বসরা পর্যন্ত এবং শাম পর্যন্ত কড়া মূল রাস্তাগুলোতে এতোটাই কড়া পাহারা বসায় যে, প্রায় এক মাস জুড়ে হযরত হুসাইন রাঃ পর্যন্ত কুফার খবর জানাতে যেতে এ এলাকা অতিক্রম করতে পারেনি। আরব থেকে আসা কেউ যাচাই বাছাই ছাড়া এ এলাকায় ঢুকতে পারেনি।

মুসলিম বিন আকীলকে জিলহজ্ব মাসের ৮ তারিখ শহীদ করা হয়। এর কয়েকদিন আগেই হযরত হুসাইন রাঃ কুফার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়ে পড়েন। তার এটা জানা ছিল না যে, কুফার গভর্ণরের আসনে এখন কোমল হৃদয়ের অধিকারী নুমান বিন বশীর রাঃ নয়, বরং পাথর দিলের অধিকারী যন্ত্রমানব উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ বসে আছে। যদি এতোটা কড়া পাহারা না হতো, তাহলে হয়তো মক্কার সীমানা পাড় হবার আগেই হুসাইন রাঃ এর কাছে কুফার প্রকৃত অবস্থা জানা হয়ে যেতো। কিন্তু কড়া চেকিং এর কারণে কেউ এ সংবাদ জান্নাতের সর্দারের কানে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে তিনি তার কাফেলা নিয়ে আগে বাড়তে লাগলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

মুসলিম বিন আকীলের হত্যার সংবাদ

ইরাকের সীমান্তের কাছে এসে হুসাইন রাঃ সংবাদ পান যে, মুসলিম বিন আকীলকে হত্যা করা হয়েছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

কুফায় এখন নতুন গভর্ণর উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদ। সে কঠোরতার সাথে রাষ্ট্রের সাথে বিদ্রোহকারী ও সহযোগীদের দমন করছে। সেই সাথে হুসাইন রাঃ জেনে গেলেন কুফার শিয়াদের প্রতারণা ও গাদ্দারী সম্পর্কেও। যারা চিঠি দিয়ে, দাওয়াত দিয়ে, বড় বড় ওয়াদা দিয়ে কুফায় দাওয়াত দিয়েছিল তাদের। কিন্তু মুসলিম বিন আকীলকে একা রেখে সবাই

পালিয়েছে। এমন কি তিনি এতোটাই অসহায় ও নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন যে, রাস্তা জিজ্ঞাসা করার মত কোন সাথী পর্যন্ত পাননি। অবশেষে কথিত শিয়ানে আলীদের সংবাদের ভিত্তিতেই গ্রেফতার হয়ে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন মুসলিম বিন আকীল।

হযরত মুসলিম বিন আকীল মুহাম্মদ বিন আশআছকে হুসাইন রাঃ এর কাছে তার পক্ষ থেকে এ সংবাদ জানাতে বলেন যে,

ارجع بأهل بيتك، ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أَصْحَاب أبيك الَّذِي كَانَ يتمنى فراقهم بالموت أو القتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني

তুমি পরিবার পরিজন নিয়ে ফিরে যাও। তুমি কুফাবাসীর ধোঁকায় পড়ো না। কেননা এরাই তারা যারা নিজেদের আপনার পিতার সাথী পরিচয় দিতো। যাদের থেকে মুক্তি পেতে আপনার পিতা মরে যেতে বা নিহত হওয়ার তামান্না করতেন। নিশ্চয় এ কুফাবাসী আপনার পিতার সাথে মিথ্যা বলেছে এবং আমার সাথেও মিথ্যা বলেছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৭৫, আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া-৮/১৫৯]

হোসাইন রা. মুসলিম বিন আকীলের খবর পেয়েও ফিরতে পারেনি কেন

হুসাইন রাঃ মুসলিম বিন আকীলের উক্ত সংবাদ শুনে কুফাবাসীর গাদ্দারী বুঝে যান। তাই তিনি ফিরে যেতে মনস্ত করলেন। কিন্তু যখনি তিনি ফিরে যাবার প্রস্তুত নিচ্ছেন তখন মুসলিম বিন আকীলের যে স্বজনরা তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারা জোশের সাথে বলতে লাগলেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম বিন আকীলের খুনের বদলা না নিবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ফিরে যাবো না। যদিও সবাই শহীদ হয়ে যাই"। একথা শুনে হুসাইন রাঃ বললেন, তোমাদের ছাড়া আমার বেঁচে থেকে কী ফায়দা? [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হুসাইন রাঃ মুসলিম বিন আকীলের শহীদ হবার খবর শুনে ফিরে যাবার বিষয়টি শিয়াদের লিখিত গ্রন্থাবলীতেও স্পষ্ট শব্দে উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন: জালাউল উয়ূন, মোল্লা বাকের মাজলিসীকৃত-১/২৬৩, নাসেখুল তাওয়ারীখ, লিসানুল মুলক মীর্যা মুহাম্মদ তক্বীকৃত-২/৩২১]

হুর বিন ইয়াযিদের পরামর্শ ও হোসাইন রা. এর দামেশে যাত্রা

হুর বিন ইয়াযিদ একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি হযরত হুসাইন রাঃ এর কল্যাণকামী ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাচ্ছেন? যখন কুফায় যাবার কথা শুনলেন, তখন খুব শক্তভাবে যেতে বারণ করলেন। বললেন, আপনি ফিরে চলে যান, সেখানে আপনার জন্য
কল্যাণের আশা নেই। এসব শুনে হযরত হুসাইন রাঃ কুফায় না গিয়ে দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করলেন। তিনি এ সিদ্ধান্তে এতোটাই অটল ছিলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ কুফার রাস্তা পাল্টে শামের দিকে রওনা করলেন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯] এর কারণ ছিল এই যে, হযরত হুসাইন রাঃ নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বুঝে গেলেন যে, ইয়াযিদের খেলাফত আসলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কুফার শিয়ারা তাকে ভুল তথ্য দিয়ে এখানে টেনে এনেছে। একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের বিরোধীতা করাটা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল।

সুতরাং তিনি শরয়ী সীমায় থেকে বিকল্প পন্থাকে বেছে নিলেন। চাইলেন যে, দামেশকে গিয়ে ইয়াযিদের সাথে মুলাকাত করতে। হতে পারে সরাসরি সাক্ষাতে ও আলাপচারিতায় উদ্দেশ্য অর্জিত হবে। হুসাইন রাঃ এর সিদ্ধান্ত দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, ইয়াযিদের খেলাফতের মৌলিক কিছু ত্রুটি থাকার পরও শরীয়তে সুযোগ থাকার কারণে উম্মতের একতা ও ভ্রাতৃত্বের খাতিরে যেসব সাহাবাগণ ইয়াযিদকে খলীফা মেনে নিয়েছে তাদের মতামতটিকে তিনি সম্মান জানাতেন। যদিও তিনি নিজে আজীমতের উপর আমল করেছেন।
হুসাইন রাঃ এর কুফায় গমণটাও নেতৃত্ব দখল ছিল না। বরং সেই মৌলিক ভুলটিকে শোধরানো মাত্র। কুফায় গিয়ে তিনি লোকদের একত্র করে হয়তো একাজটিই করতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি পরিবর্তিত দেখে তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথেই এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনাকে জরুরী মনে করলেন। এছাড়া আর কোন রাস্তাও অবশ্য ছিল না। যদিও একথা স্পষ্ট ছিল যে, কুফা ও দামেশকের পলিসি একই হবে। উভয় স্থানেই হুসাইন রাঃ কে রাষ্ট্রদ্রোহী মনে করা হচ্ছে। কিন্তু হুসাইন রাঃ ইবনে যিয়াদের কঠোর নীতি দেখে তিনি বুঝে গেছেন যে, ইয়াযিদ আমার সাথে ইবনে যিয়াদের মত এমন কঠোরতা করবে না। কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে অন্তত আমার মতামত জানতে চাইবে। যা ইবনে যিয়াদের ক্ষেত্রে ভাবা যায় না।
হযরতে হুসাইন রাঃ এর ইয়াযিদের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সঠিক ও যথার্থ ছিল। এ কারণেই হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদতের পর ইয়াযিদ বলতেন যে, 'আমার কি বিগড়ে যেতো যদি

আমি কিছু কষ্ট সহ্য করে নিতাম। হুসাইন রাঃ কে নিজের ঘরে ডেকে নিতাম। তিনি যা চান তাই নিতে তাকে ক্ষমতা দিতাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয় এর হক এর এটাইতো তাকাযা ছিল। যদিও তাতে আমার হুকুমতের শক্তি ও শওকত হ্রাসই পেতো'। [তারীখে তাবারী-৫/৫০৬/

হুসাইন রাঃ কুফার রাস্তা রেখে দামেশকের দিকে প্রায় ৪৫ মাইল সাড়ে ৭২ কিলোমিটার সফর করে কারবালা নামক স্থানে এসে পৌঁছে গেলেন। যা কুফা থেকে দামেশ্ব যাবার মহাসড়কে অবস্থিত। ফুরাত নদীর পাড়ও ছিল নিকটে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

দামেশের পথে বাধা :

উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ চাইলে হুসাইনী কাফেলাকে দামেশকের দিকে যেতে দিতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। আফসোসের বিষয় হল, চরম ধৃষ্টতার সাথে সে হুসাইন রাঃ কে দামেশকের দিকে যেতে না দিয়ে গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে আসার স্পর্ধাসূচক আদেশ জারী করে। প্রশ্ন হল, সে এমনটা করল কেন? তাহলে কি ইয়াযিদের পক্ষ থেকে হুসাইন রাঃ কে এভাবে গ্রেফতার করার নির্দেশ ছিল? বাস্তব কথা হল, হযরত হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে পৌঁছার পর থেকে দশে মহররম পর্যন্ত কুফা ও দামেশকের মাঝে কোন প্রকার যোগাযোগ ও কথোপকথন করা সম্ভব ছিল না।

কারণ, কুফা ও দামেশকের মাঝে দূরত্ব হল ৯০৪ কিলোমিটার। যদি কোন দ্রুতগামী ঘোড়াও প্রতিদিন একশ' কিলোমিটার সফর করে। তবু দামেশক পৌঁছতে নয় থেকে দশ দিন লেগে যাবে। আবার সেখান থেকে নতুন পয়গাম নিয়ে কুফা আসতেও এমন সময় লাগতো। এর মানে ইয়াযিদের কাছ থেকে কুফায় পয়গাম আসতে কমপক্ষে ১৮ কিংবা ১৯ দিনের দরকার। অথচ হুসাইন রাঃ ইরাক সীমান্তে আসার পর থেকে কারবালায় হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত ৫দিন সময়ও অতিক্রম করেনি। বরং ১০ই মুহররমই সকলকে শহীদ করে ফেলা হয়। এর দ্বারা পরিস্কার বুঝা যায় যে, কারবালা প্রান্তরে ইবনে যিয়াদ কর্তৃক হত্যাযজ্ঞে ইয়াযিদের সরাসরি কোন নির্দেশ ছিল না। বরং ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা অনুপাতে সব ধরণের পদক্ষেপের জন্য নিজেকে উপযুক্ত মনে করে একক সিদ্ধান্তে সে তা করেছে। নতুন কোন নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করেনি। ইয়াযিদের আগের নির্দেশনা ছিল কুফাকে নিয়ন্ত্রণ করা। কুফার লোকজন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিল। হযরত হুসাইন রাঃও পরিস্থিতি আঁচ করে কুফার বদলে দামেশকে যাবার জন্য যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন। এর মানে হুসাইন রাঃ এর কারণে কুফায় কোন প্রকার অস্থিরতা হবার সুযোগই ছিল না। তারপরও উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন রাঃ কে দামেশক যেতে দিলো না কেন? তারতো এজন্য খুশি হবার কথা যে, সে তার দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকা

পুরোপুরি শান্ত ও নিরাপদ রেখেছে। একটি পরীক্ষা থেকে নিজেকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এরপরও সে কেন এমন পৈশাচিক কাজ করল?
আসলে ইবনে যিয়াদের কর্মকা- থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন কঠোর মানসিকতা সম্পন্ন কমান্ডার ছাড়া কিছু নয়। তার দৃষ্টিতে হযরত হুসাইন রাঃ ছিলেন রাষ্ট্রের বিরোধী একজন ভয়ানক বিদ্রোহী মাত্র। বিদ্রোহী চরম পর্যায়ের অপরাধী হয়ে থাকে। এমন অপরাধীকে ক্ষমা করা যায় না। এছাড়া তার মাথায় স্বৈরতান্ত্রিক দাপুটে শাসকের ভুতও সওয়ার হয়েছিল। সে যেভাবে মুসলিম বিন আকীল রাঃ এবং হুর বিন উরওয়াকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তেমনি হুসাইন রাঃ কে হত্যা করে নিজের ক্ষমতার ত্রাস সৃষ্টি করতে চেয়েছে। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সাহস করবেতো দূরে থাক কল্পনাই করতে না পারে।

যদি ইবনে যিয়াদের শুধুমাত্র তার দায়িত্বপ্রাপ্ত কুফার ষড়যন্ত্রকারীদেরই নির্মূল করাই মাকসাদ হতো, তাহলে নুমান বিন বশীর রাঃ কে বরখাস্তকরণ এবং কুফায় তার নিয়োগ, আহলে ইরাকের উপর পূর্ণাঙ্গ আধিপত্য, মুসলিম বিন আকীল ও হুরকে হত্যা করার সংবাদ হযরত হুসাইন রাঃ এর কাছে পৌঁছতে দিতো। যাতে করে হুসাইন রাঃ কুফায় আসার চিন্তাই বাদ দিয়ে দেন। কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ পর্যন্ত উপরোক্ত পট পরিবর্তনের সংবাদ না পৌঁছানোর জন্য শহরের সীমান্ত জুড়ে কড়া অবরোধ আরোপ করে সেই পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। ফলে হযরতে হুসাইন রাঃ সঠিক সময়ে সংবাদই পাননি।

এ কারণেই হযরত হুসাইন রাঃ কুফার সীমান্তে এসে গেছেন। আসলে ইবনে যিয়াদ এটাই চাচ্ছিল যে, হযরতে হুসাইন রাঃ বেখবর অবস্থায় কুফায় আসবেন আর তাঁকে অপ্রস্তুত অবস্থায় গ্রেফতার করা হবে। সে যেন এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, সে কতবড় রাজনীতিবীদ! কত শক্তিমান শাসক। হযরত হুসাইন রাঃ এর মত ব্যক্তিত্বকে নিজের জালে আটকে ফেলেছে।

এজন্যই সে সীমান্তবর্তী টহল বাহিনীকে অর্ডার দিয়ে রেখেছিল যে, হযরত হুসাইন রাঃ আসার সাথে সাথে দ্রুত গ্রেফতার করে যেন তার দরবারে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু হযরত হুসাইন রাঃ এ নির্দেশ মানতে অস্বিকার করেন। সেনা কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদ নবী পরিবারের প্রতি মোহাব্বত, তার কোমল হৃদয়ের কারণে হুসাইন রাঃ কে গ্রেফতার না করে চলে যেতে সুযোগ করে দেন।

উমর বিন সা'দের কারবালা রওনা

তেহরানের গভণরী দেবার আশ্বাস দিয়ে উবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদ উমর বিন সা'দকে হুসাইন রাঃ কে নিঃশর্তে গ্রেফতার করার দায়িত্ব অর্পণ করে। আদেশ করে: যদি হুসাইন রাঃ স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে যেন হত্যা করা হয়। যেহেতু হুসাইন রাঃ এর মত
ব্যক্তিত্বের উপর হাত উঠানো কিয়ামত পর্যন্তের জন্য বদনামীর কারণ হবে, তাই উমর বিন সা'দ এ দায়িত্ব গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তার বাড়ি ঘর ধ্বংস করা এবং গর্দান উড়িয়ে দেবার ধমকি প্রদান করে। [তাবক্কাতে ইবনে সা'দ-৫/১৬৮]
উমর বিন সা'দ সকাল পর্যন্ত ভাবার জন্য সুযোগ চায়। সারা রাত চিন্তা করে সকালে সম্মতি জানিয়ে বাহিনী নিয়ে কারবালা প্রান্তরে পৌঁছে যায়। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

কারবালা প্রান্তরে যুদ্ধের শুরু :

হিজরী ৬১ হিজরীর ৯ই মহররম। কারবালা প্রান্তরে সরকারী বাহিনীর অফিসার উমর বিন সা'দ, শিমার বিন জিলজাওশান এবং হুসাইন বিন নুমাইরের সাথে হযরত হুসাইন রাঃ এর আলোচনা হয়। হযরত হুসাইন রাঃ তাদেরকে আল্লাহ ও ইসলামের ওয়াস্তা দিয়ে বলেন,
أَنْ يُسَيِّرُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدَ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ،
আমাকে আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দিন। আমি আমার হাত তার হাতে দিয়ে দেবো। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]
কিন্তু ইবনে যিয়াদের পক্ষ থেকে হযরত হুসাইন রাঃ কে শর্তহীনভাবে গ্রেফতার করার আদেশ ছিল। তাই সেনাপ্রধান জবাব দিল: "এছাড়া কোন পথ নেই যে, আপনি সিদ্ধান্তের জন্য নিজেকে ইবনে যিয়াদের কাছে আত্মসমর্পণ করুন। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৭০]
হুসাইন রাঃ এর তিন প্রস্তাব
যখন সকল পথ রুদ্ধ হতে দেখলেন তখন হুসাইন রাঃ দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। যথা-
১. আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই ফেরত যাবার সুযোগ দেয়া হোক।
২. ইয়াযিদের কাছে যাবার সুযোগ দেয়া হোক। যেন তার হাতে বাইয়াত হতে পারেন। তাদের ভিতরকার মতভেদ যেন দূরিভূত হয়ে যায়।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্তে পৌঁছে দেয়া হোক। যেন তিনি অন্যান্য মুসলমানদের মতই জীবন যাপন করতে পারেন।

উমর বিন সা'দ এ প্রস্তাব মেনে নেয়। উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে এ বিষয়ে জানায়। কিন্তু ইবনে যিয়াদ তা অস্বিকার করে। শর্ত ছাড়া গ্রেফতার করার জন্য জোর নির্দেশ প্রদান করে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৯৭]
উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ প্রথমত হযরত হুসাইন রাঃ এর প্রস্তাব মেনে নিতে চাইলেন। কিন্তু শিমার বিন জিলজাওশান তাকে বুঝায় যে, শর্তহীন গ্রেফতারটাই সঠিক সিদ্ধান্ত। যাতে করে সব কিছু হুকুমতের অধীন থাকে।
শিমার উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদকে বলে, আল্লাহ দুশমনকে আপনার কাবুতে এনে দিয়েছেন। আপনি তাকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছেন? [তারীখে তাবারী-৫/৪১৩-৪১৪,আলমিহান-১৫৪]
শিমারের কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ হুসাইন রাঃ এর শান্তি প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। [আলমিহান-১৫৪] আবারো শর্তহীন আত্মসমপর্ণের জন্য হুসাইন রাঃ কে বলা হয়। কিন্তু এভাবে অসহায় আত্মসমর্পণ কেবল নবী পরিবারের অসম্মানই নয়, বরং সেই মহান উদ্দেশ্যও ধুলায় মিশে যায়, যে উদ্দেশ্য সফলের লক্ষ্যে নিজের পরিবারের সদস্য পর্যন্ত ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করেছেন। এ কারণে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, কিছুতেই তিনি শর্তহীন আত্মসমর্পণ করবেন না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৩৯]
এদিকে উমর বিন সা'দ যুদ্ধ না করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ইবনে যিয়াদ কুফায় বসে পুরো পরিস্থিতির ক্ষণে ক্ষণে সংবাদ রাখছিল। সে কড়া নির্দেশ প্রদান করে জুআইরিয়া বিন বদর তাইমীকে পাঠায় যে, উমর বিন সা'দকে বল যে, দ্রুত হামলা করতে, নতুবা তাকে হত্যা করা হবে।

উমর বিন সা'দ সেদিন সুযোগ দিল হুসাইন রাঃ কে চিন্তা ভাবনা করার জন্য। পরদিন উবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের কড়া নির্দেশ পাবার পর উমর বিন সা'দ হাতিয়ার নিল এবং যুদ্ধ শুরু করার ঘোষণা দিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]
৬১ হিজরীর মহররম মাসের ১০ তারিখ। শুক্রবার মতান্তরে শনিবার উমর বিন সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে ফজরের নামায শেষে যুদ্ধের জন্য সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল। উল্লেখ্য যে, সে দিন ছিল আশুরার দিন। এদিকে হযরত হুসাইন রাঃ ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়লেন। আর তারা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশ পদাতিক যোদ্ধা। এরপর তিনি তাঁদেরকে সারিবদ্ধ করলেন। ডানপাশের কমান্ডার বানালেন যুহাইর বিন কায়সকে আর বাম পাশের জন্য নির্ধারণ করলেন হাবীব বিন মুতাহহারকে। তাঁর ঝাণ্ডা প্রদান করলেন তাঁর ভাই আব্বাস বিন আলীকে। আর তাঁদের সঙ্গের মেয়েদেরকে তাঁবুগুলিতে তাদের পেছনে নিয়ে আসলেন।
এদিকে হুসাইন রাঃ এর নির্দেশমত রাতেই তারা তাদের তাঁবুর পেছনে পরিখা খনন করে তাতে জ্বালানি কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ফেলে রেখেছিলেন। এরপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল। যাতে করে পেছন থেকে কেউ তাঁবুর কাছে ঘেঁষতে না পারে। আর উমর বিন

সা'দ তাঁর বাহিনীর ডান পার্শ্বের কমান্ডার বানালো আমর বিন হাজ্জাজ আয যুবাইদীকে। বাম পাশের জন্য শিমার বিন জুলজাওশানকে। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আযরাহ বিন কায়স আল আহমাসী। আর পদাদিক বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল শাবীছ বিন রিবয়ীর। আর ঝান্ডা ছিল ওয়ারদানের হাতে। উভয় পক্ষ স্ব স্ব স্থানে স্থির হয়ে থাকলো। [আলবিদায়া ওয়াননিয়াহা-৮/১৭৮, আরবী, ৮/৩৩৩, বাংলা]

হুসাইন রাঃ এর গায়ে মোটা জোব্বা ছিল। উমর বিন সা'দের বাহিনীর উমর তাহয়ী নামক সৈন্য তীর ছুড়ল। তীর গিয়ে হুসাইন রাঃ এর কাঁধে এসে আঘাত করল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

এ সময় কুফার ঘোরসওয়ার বাহিনীর কমান্ডার হুর বিন ইয়াযিদের বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠল। সে সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধাংদেহী মনোভাব দেখে তিরস্কার করে বলতে লাগল, তোমরা কি হুসাইন রাঃ এর আবেদন গ্রহণ করবে না? আল্লাহর কসম! যদি এমন দরখাস্ত তুর্কিস্তান ও দায়লামের কাফেররাও করতো, তাহলে তা তোমাদের জন্য রদ করা জায়েজ হতো না। এতে করে সৈন্যদের মাঝে কোন প্রভাব সৃষ্টি হয়নি। তখন তিনি বেশ নিজ বাহিনী ছেড়ে হুসাইন রাঃ এর বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন। তাদের সাথে শরীক হয়ে গেলেন। তার পূর্ব আচরণের জন্য হুসাইন রাঃ এর কাছে ক্ষমা চাইলেন। বলেন, আমি যদি আগে তাদের ইচ্ছের কথা জানতাম, তাহলে আমি আপনার সাথে ইয়াযিদের কাছে যেতাম।

এরপর তিনি বাহিনীর সামনে এসে উমর বিন সা'দকে বললেন, দুর্ভাগ্য! তোমাদের নবীর দৌহিত্রের প্রস্তাবিত তিনটি বিষয়ের একটিও কি তোমরা গ্রহণ করবে না? তখন সে বলল, তা গ্রহণ করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/১৮০, ৮/৩৩৬]

তারপর যুদ্ধ শুরু হল। হুর বিন ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদের বাহিনীর উপর হামলা করলেন। দুইজন সৈন্যকে হত্যা করে নিজেও শহীদ হয়ে গেলেন। [তারীখে তাবারী-৩/৩৯২]

হুসাইন রাঃ কে অপমান ও পরিণতি

যুদ্ধকালে এক বদবখত দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল: তোমাদের মাঝে কি হুসাইন আছে? উত্তর আসল: আছে। তখন সে বলল, তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দাও। হযরত হুসাইন রাঃ শুনে বললেন, না। বরং আল্লাহ তাআলা ক্ষমাকারী। তিনি মেহেরবান এবং দয়ালু। যার আনুগত্য করা হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, তুমি কে?সে বলল, আমি হাওজা এর ছেলে। তখন তিনি অবচেতনে বলে ফেললেন, হে মালিক! তাকে জাহান্নামে টেনে নাও।সে সময় তার ঘোড়া আচমকা ছুটতে শুরু করে। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। তার পা রিকাবে আটকে যায়। ঘোড়া তাকে ছেচড়াতে ছেচড়াতে নিয়ে চলে। এর ফলে তার পুরো শরীর টুকরো টুকরো

হয়ে যায়। রেকাবে শুধু তার পা দু'টি বাকি থাকে। [মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, হাদীস নং-৩৭৩৬৯, আলমু'জামুল কাবীর, তাবারানীকৃত-৩/১১৬]

আব্দুল্লাহ এর শাহাদত

হযরত হুসাইন রাঃ এর ছেলে আব্দুল্লাহ। অত্যান্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী ছিলেন। এক কুফী সৈন্য তাঁকে দেখে বলল, তাকেতো আমি অবশ্যই হত্যা করবো। অন্যান্যরা বুঝাল যে, এমন ছোট্ট নাবালেগ শিশুকে হত্যা করে তোর কী ফায়দা? কিন্তু সেই কুফী তার উপর হামলা করল এবং তাকে হত্যা করল। যখন তার উপর আঘাত করছিল, তখন আব্দুল্লাহ চিৎকার বলে উঠলেন: হে চাচা! হযরত হুসাইন রাঃ আওয়াজ শুনে বলতে লাগলেন: এমন ব্যক্তির আওয়াজে লাব্বাইক, যার সাহায্যকারী কম কিন্তু শত্রু অনেক বেশি। হুসাইন রাঃ হামলাকারীর উপর আক্রমণ করে এক আঘাতে তার এক হাত এবং আরেক আঘাতে তাকে হত্যা করেন। তারপর আম লড়াই শুরু হয়ে গেল। [আলমিহান-১৫৪]

শিয়া কুফীদের গাদ্দারী

হুসাইন রাঃ যখন কুফার বদলে দামেশক যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তখন কুফী শিয়ারা চোখেমুখে অন্ধকার দেখতে শুরু করে। তাদের মূল মাকসাদ ছিল হুসাইন রাঃ কে ভুল বুঝিয়ে কুফায় এনে একটি হাঙ্গামা সৃষ্টি করা। কিন্তু হুসাইন রাঃ পরিস্থিতি বুঝে যান। চিঠি লেখক শিয়াদের মিথ্যাচার নিজ চোখে অবলোকন করেন। শিয়াদের লক্ষ্য করে হুসাইন রাঃ এর বক্তব্য আমরা শিয়াদের গ্রন্থ থেকে একটু দেখে নেই:

হুসাইন রাঃ কুফীদের লক্ষ্য করে বলেন, আফসোস! তোমরাতো ঐ লোক! যারা আমার পিতা হযরত আলী রাঃ কে ধোঁকা দিয়েছো। তারপর তাকে শহীদ করেছো। তারপর আমার ভাই হাসান রাঃ কে আহত করেছো। আমার চাচাতো ভাই মুসলিম আকীল রাঃ কে কুফায় কতল করেছো। সত্য কথা হলো, যারাই তোমাদের প্রতারণায় ফেঁসে গেছে তারা বড় আহমক। [জালাউল উয়ূন।

হুসাইন রাঃ বলেন,হে জনতা! তোমরা যেন ধ্বংস হও। দুর্দশাগ্রস্ত হও। তোমরা উৎসাহের সাথে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে তোমাদের সাহায্য করার জন্য এবং আমরা তা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু তোমরা এখন সে তরবারিগুলো কোষমুক্ত করেছো যা আমরা
শাকিলা আপু, [5/19/2025 3:29 PM]

তোমাদের দিয়েছি এবং তোমরা আমাদের জন্য আগুন জ্বালিয়েছো যা আমরা তোমাদের ও আমাদের শত্রুদের জন্য জ্বালিয়েছিলাম। তোমরা তোমাদের শত্রুদের পক্ষ নিয়েছো এবং তাদের সাথে থেকে তোমাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অগ্রসর হয়েছো।
[শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/১৯৯-২০০]

হুসাইন রাঃ এর আরেকটি বক্তব্য আসছে শিয়াদের গ্রন্থে:
হে কুফার লোকেরা, তোমাদের মায়েরা তোমাদের হারাক। তোমরা আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে, এরপর যখন তিনি তোমাদের কাছে এলেন, তোমরা তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিলে। অথচ তোমরা তার জীবন রক্ষার্থে জীবন দিতে চেয়েছিলে। এখন তোমরা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছো তাকে হত্যা করার জন্য। তোমরা তাকে আটক করেছো এবং তার জামার কলার ধরেছো এবং তাকে চারদিক থেকে ঘেরাও করেছো যেন তিনি আল্লাহর প্রশস্ত শহরগুলোতে পালিয়ে যেতে না পারেন।[শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস-১/২০৭-২০৮]

হযরত হুসাইন রাঃ চিঠি প্রদান করে কুফায় দাওয়াতদাতা এসব শিয়া নামধারী গাদ্দারদের পল্টিবাজী দেখে দামেশক যাবার মনস্ত করেন। কিন্তু এসব গাদ্দাররা তখন তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার আতংকে পড়ে যায়। কারণ, হুসাইন রাঃ এর সাথে তাদের চিঠি ছিল। যাতে তাদের নামও ছিল। যারা হুসাইন রাঃ কে কুফায় এসে তাদের বাইয়াত নিয়ে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিয়েছিল। এখন দামেশকে গিয়ে এসব ইয়াযিদকে দেখালে এসব চিঠি লেখকরা সব রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে বিচারের মুখোমুখি হবে। তাই তারা কিছুতেই চাচ্ছিল না যে, হুসাইন রাঃ দামেশকে যান। তাই তারা দ্রুতই হুসাইন রাঃ এর দলত্যাগ করে তাকে হত্যায় সহযোগিতা শুরু করে। যাতে করে তাদের গাদ্দারীর প্রমাণ বাকি না থাকে।

কুফার কিছু লোকেরা কারবালা প্রান্তরের বিভিন্ন উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখছিল। হুসাইন রাঃ এর সহায়তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে ছিল। যেন আসমান থেকে সাহায্য এসে হুসাইন রাঃ কে উদ্ধার করে। কিন্তু নিজেরা কিছুই করতে রাজী নয়। তখন একজন ওদের বলে যে, আরে আল্লাহর দুশমনেরা! একটু নিচে এসে হুসাইন রাঃ কে সাহায্য করছো না কেন? কিন্তু তারা কোন উত্তরও না দিতে পারলো না। সাহায্য করতে এগিয়েও এলো না। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

হযরত হুসাইন রাঃ এর শাহাদত

হুসাইন রাঃ এর সাথে শ'য়ের কাছাকাছি লোক ছিল। তাদের মাঝে হযরত আলী রাঃ এর ৫ ছেলে। বনু হাশেমের ১৬ জন। বনু সালীম এবং বনু কেনানার এক এক দল ছিল। ইবনে উমর বিন যিয়াদ নামের এক ব্যক্তিও শামিল ছিল। [তারীখে তাবারী-৫/৩৯২]

অবশেষে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর হাতে হযরত হুসাইন রাঃ এর সকল সাথীবর্গ শহীদ হয়ে যান। যাদের মাঝে দশজন যুবক হুসাইন রাঃ এর নিজের ঘরের ছিলেন। এক তীর এসে হুসাইন রাঃ এর কোলের শিশুর গায়ে এসে লাগে। এতে উক্ত কোলের শিশুটিও শাহাদত বরণ করেন। হুসাইন রাঃ শিশুটির শরীর থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের এবং তাদের মাঝে তুমিই ইনসাফ কর। ওরা আমাদের এজন্য ডেকেছে যে, তারা আমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু ওরা এখন আমাদের হত্যা করছে। [তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]

হযরত হুসাইন রাঃ এর এ দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে, ওরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। গায়ের কাপড় খুলে বেইজ্জাত করতে চাইবে। তাই তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। বললেন, আমাকে এমন একটা কাপড় দাও, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পছন্দ করবে না। যাতে করে কাপড় খুলে নিলেও কম দামী উক্ত চাদরটি যেন শরীরে রেখে যায়। একদম উলঙ্গ করে না ফেলে। তারপর তিনি একটি পুরাতন চাদর জামার নিচে পরিধান করলেন। তারপর তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এলেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]
দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াযিদ বাহিনীর সৈন্যরা হযরত হুসাইন রাঃ কে হত্যার সুযোগ পেয়েও করছিল না। এর কারণ হল, তাদের কেউ হুসাইন রাঃ কে হত্যার দায় নিতে চাচ্ছিল না। একজন চাচ্ছিল অন্যজন হত্যা করুক। অবশেষে শিমার জিলজাওশান সৈন্যদের আহবান করে বলল, তাঁকে হত্যার ব্যাপারে তোমাদের কিসের অপেক্ষা? তখন যুরআন বিন শারীক তামীমী হুসাইন রাঃ এর দিকে অগ্রসর হয়ে কাঁধে তরবারী দ্বারা আঘাত করল। এরপর সিনান বিন আনাস আমর নাখয়ী তাঁকে বর্শা দ্বারা আঘাত করল। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে মাথা কেটে ফেলে। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]
হুসাইন রাঃ বীরের মত লড়তে লড়তে কারবালা প্রান্তরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]
নিকৃষ্ট খুনীরা হযরতের শরীর থেকে সকল কাপড় খুলে নেয় পুরাতন চাদরটি ছাড়া। শরীর থেকে মাথাকে আলাদা করে ফেলে। [আলমু'জামুল কাবীর লিততাবারানী-৩/১১৭, তারীখে তাবারী-৫/৩৮৯]
শিমার হযরত আলী আসগর তথা যাইনুল আবেদীন রহঃ কে হত্যা করতে উদ্যত হয়। তখন হুমায়দ বিন মুসলিম তাকে তা থেকে নিবৃত করে। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ্য ছিলেন। এরপর সেনাপতি উমর বিন সা'দ এসে বলল, সবাই শুনে রাখ! কেউ যেন এ মেয়েদের তাঁবুতে প্রবেশ না করে এবং এই বালককে হত্যা না করে। আর যে তাঁদের কোন সামানপত্র নিয়েছে, সে যেন তা ফিরিয়ে দেয়। [আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-৮/৩৫২]

কারবালার শহীদ :

কারবালা প্রান্তরে হযরত হুসাইন রাঃ এর সাথে আবু তালেবের পরিবারের ১৮ জন ব্যক্তি শহীদ হন।

৬ জন হুসাইন রাঃ এর ভাই। যথা- ১) আব্বাস। ২) জা'ফর। ৩) উবায়দুল্লাহ। ৪) উসমান। ৫) মুহাম্মদ। ৬) আবু বকর।

২ জন হুসাইন রাঃ এর ছেলে। যথা ১) আব্দুল্লাহ। ২) আলী আকবর।

৩ জন হাসান রাঃ এর এর ছেলে। যথা- ১) কাসেম। ২) আবু বকর। ৩) আব্দুল্লাহ।

৩ জন আকীল বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে (মুসলিম বিন আকীল রাঃ এর ভাই)। যথা- ১) জা'ফর। ২) আব্দুর রহমান। ৩) আব্দুল্লাহ।

২ জন আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব রাঃ এর ছেলে। যথা- ১) আউন। ২) মুহাম্মদ।

২ জন আকীল রাঃ এর নাতি। যথা- ১) আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম। ২) মুহাম্মদ বিন আবী সাঈদ বিন আকীল।

উমর বিন সাঈদের সৈন্যদের ৮৮ জন নিহত হয়। [তারীখে খলীফা ইবনে খাইয়্যাত-২৩৪-২৩৫, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া-১১/৫৫১-৫৫২]

হুসাইন রাঃ এর ছেলে আলী বিন হুসাইন তথা যাইনুল আবেদীন অসুস্থ্য ছিলেন। উমর বিন সা'দ সৈন্যদের বলল, তাকে যেন কিছু না করা হয়। [তারীখুল কাবীর লিইবনে আবী খায়ছামা-২/৯১৪]

কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর :

১. হুসাইন রাঃ ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে রাজী হবার পরও কেন ইবনে যিয়াদের কাছে বাইয়াত হতে রাজী হননি? অথচ ইবনে যিয়াদতো নিজের বাইয়াত নয়, বরং ইয়াযিদের আনুগত্বেরই বাইয়াত গ্রহণ করতো।

আসল বিষয় হল, হযরত হুসাইন রাঃ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের আজমত ও ইজতিহাদী অবস্থানের উপর অটল ছিলেন। তিনি যেহেতু কুফী শিয়াদের পত্র ও দূতদের মাধ্যমে জেনেছেন যে, কুফীরা সবাই হুসাইন রাঃ এর অপেক্ষায়। তারা কেউ ইয়াযিদের পক্ষে নয়। তারা হুসাইন রাঃ এর নেতৃত্ব চায়। আর ইয়াযিদের ক্ষমতায় আরোহন পদ্ধতি পূর্ববর্তী খলীফাগণের স্বীকৃত পদ্ধতিতে ছিল না। তাই এ পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন। যাতে করে এটি প্রচলিত হয়ে বংশীয় শাসনের ধার চালু হয়ে না যায়।

এ দু'টি মৌলিক বিষয়কে সামনে রেখে হযরতে হুসাইন রাঃ কুফায় আগমণ করেন। এসে যখন দেখলেন যে, কুফার শিয়ারা মিথ্যা বলেছে। আসলে পুরো ইরাক ইয়াযিদের খেলাফত

মেনে নিয়েছে। তারা সকলেই ইয়াযিদের ঝান্ডার নিচে ঐক্যবদ্ধ। কেউ ইচ্ছেয়, কেউ অনিচ্ছায়। কিন্তু সকলেই ইয়াযিদের নেতৃত্ব ও হুকুমত মেনে নিয়েছে।

আর চিঠি লেখক কুফীরা। যারা নিজেদের শিয়া দাবী করেছে এরা সকলেই গাদ্দারী করে পলায়ন করেছে। তখন তিনি সরাসরি ইয়াযিদের সাথে সাক্ষাৎ করে তার হাতে বাইয়াত হতে চাইলেন। যাতে করে তার মূল উদ্দেশ্য বিষয়ে সরাসরি কথা বলে একটি সুরাহা বের করতে পারেন। যা রাজনৈতিক সন্ধি হবে। এ সন্ধির ক্ষমতা কেবল ইয়াযিদের হাতেই আছে। উবায়দুল্লাহ যিয়াদের হাতে নেই। কারণ, সে কেবল একজন গভর্ণর। ইয়াযিদের হুকুমের গোলাম। এ কারণে তার হাতে বাইয়াত হয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া সে নিঃশর্ত বাইয়াত নিয়ে হুসাইন রাঃ এর মূল উদ্দেশ্যের উপরই পানি ফেলে দিচ্ছিল। এ কারণে হযরতে হুসাইন রাঃ তার আদর্শের জন্য শহীদ হতে রাজী হলেন, কিন্তু আদর্শ বিসর্জন দিতে রাজী হলেন না।

২. কারবালার যুদ্ধ কি ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ ছিল?

হযরত হুসাইন রাঃ ও উমর বিন সা'দ এর মধ্যকার আলোচনা এবং হুসাইন রাঃ এর তিন প্রস্তাবের দিকে একটু ভালো করে নজর বুলালে আমাদের কাছে অনেক কিছু পরিস্কার হয়ে যায়।

ক) ইয়াযিদের হাতে বাইয়াত হতে চাওয়া।

খ) ইয়াযিদের শাসনকৃত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া।

গুরুত্বপূর্ণ এ দু'টি বিষয় এতে চলে আসছে। এর মানে ইয়াযিদের নিয়োগ পদ্ধতি হুসাইন রাঃ এর পছন্দ না হলেও, তিনি ইয়াজিদের শাসনকে কুফরী শাসন মনে করতেন না। তার হাতে বাইয়াত হওয়াকে কাফেরের হাতে বাইয়াত মনে করতেন না। আর কারবালায়

আগমণ ইসলাম ও কুফরীর পার্থক্য নির্ণয়ক বিষয় ছিল না। যদি ইয়াযিদ তখন পর্যন্ত কাফের হতো। ইসলাম বিকৃতকারী হতো। ইসলামের দুশমন হতো। নবীজীর দুশমন হতো। তাহলেই এটি ইসলাম ও কুফরীর যুদ্ধ হতো ।

৩. হুসাইনের হত্যায় ইয়াযীদ কতটুকু দায়ী?

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: সকল মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিকের ঐকমত্যে ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া হুসাইনকে হত্যার আদেন দেন নি। বরং তিনি উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদকে চিঠির মাধ্যমে আদেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন ইরাকের জমিনে হুসাইনকে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাঁধা দেন। এতটুকুই ছিল তার ভূমিকা। বিশুদ্ধ মতে তার কাছে যখন হুসাইন নিহত হওয়ার খবর পৌঁছল তখন তিনি আফসোস করেছেন। ইয়াযীদের বাড়িতে কান্নার ছাপ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি হুসাইন পরিবারের কোনো মহিলাকে বন্দী বা দাসীতে পরিণত করেন নি; বরং পরিবারের সকল সদস্যকে সম্মান করেছেন। সসম্মানে হুসাইন পরিবারের জীবিত সদস্যদেরকে মদিনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

যে সমস্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইয়াযীদ আহলে বাইতের মহিলাদেরকে অপদস্থ করেছেন এবং তাদেরকে বন্দী করে দামেস্কে নিয়ে বেইজ্জতি করেছেন, তার কোনো ভিত্তি নেই। বনী উমাইয়াগণ বনী হাশেমকে খুব সম্মান করতেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ যখন ফাতেমা বিনতে আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফরকে বিয়ে করলেন তখন আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ান এই বিয়ে মেনে নেন নি। তিনি হাজ্জাজকে বিয়ে বিচ্ছিন্ন করার আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয় হুসাইন হত্যার জন্য দায়ী উবাইদুল্লাহ ইবন যিয়াদের কাছে যখন হুসাইনের পরিবারের মহিলাদেরকে উপস্থিত করা হল তখন তিনি আলাদাভাবে তাদের জন্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করলেন এবং তাদের ভরণ-পোষণ ও পরিধেয় বস্ত্রের ব্যবস্থা করলেন।

(ইবনে জারীর হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন)

ঐতিহাসিক ইজ্জত দাররুযা বলেন: হুসাইন হত্যার জন্য ইয়াযীদকে সরাসরি দায়ী করার কোনো দলীল নেই। তিনি তাঁকে হত্যার আদেশ দেন নি। তিনি যেই আদেশ দিয়েছেন, তার সার সংক্ষেপ হচ্ছে, তাঁকে ঘেরাও করা হোক এবং তিনি যতক্ষণ যুদ্ধ না করবেন ততক্ষণ যেন তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করা হয়।

ইমাম ইবনে কাছীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন: এটি প্রায় নিশ্চিত যে ইয়াযীদ যদি হুসাইনকে জীবিত পেতেন, তাহলে তাঁকে হত্যা করতেন না। তাঁর পিতা মু'আওয়িয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এ মর্মে অসীয়তও করেছিলেন। ইয়াযীদ এই কথাটি সুস্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন।

8. ইয়াযীদ সম্পর্কে একজন মুসলিমের ধারণা কেমন হওয়া উচিত ?

সালাফে সালেহীনের নিকট গ্রহণযোগ্য এবং অনুকরণীয় কোনো ইমামের কিতাবে ইয়াযীদের উপর লা'নত করা বৈধ হওয়ার কথা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ তার নামের শেষে রাহিমাহুল্লাহ বা লা'আনা হুল্লাহ- এ দু'টি বাক্যের কোনোটিই উল্লেখ করেন নি।

সুতরাং তিনি যেহেতু তার আমল নিয়ে চলে গেছেন, তাই তার ব্যাপারে আমাদের জবান দরাজ করা ঠিক নয়। তাকে গালাগালি করাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া আর কিছু অর্জিত হবে না। তার আমল নিয়ে তিনি চলে গেছেন। আমাদের আমলের হিসাব আমাদেরকেই দিতে হবে। তার ভাল মন্দ আমলের হিসাব তিনিই দিবেন।

ইমাম যাহাবী ইয়াযীদের ব্যাপারে বলেন:

لا نسبه ولا نحبه

অর্থাৎ "আমরা তাকে গালি দিবো না এবং ভালও বাসবো না।" মদ পান করা, বানর নিয়ে খেলা করা, ফাহেশা কাজ করা এবং আরও যে সমস্ত পাপ কাজের অপবাদ ইয়াযীদের প্রতি দেওয়া হয়, তা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর চেয়ে হুসাইন যে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং ইয়াযীদ মুসলিম ছিলেন। তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আমরা যেহেতু উপস্থিত ছিলাম না, তাই তার ব্যাপারটি আল্লাহর উপর ছেড়ে দেয়াই অধিক নিরাপদ। তা ছাড়া বুখারী শরীফের একটি হাদীছে তার ক্ষমা পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে আছে যে,
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: আমার উম্মতের একটি দল কুস্তুনতীনিয়ায় (কনস্টান্টিনোপল) যুদ্ধ করবে তাদেরকে ক্ষমা করা দেওয়া হবে। জানা যাচ্ছে, ইয়াযীদ ইবন মু'আওয়িয়া ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। আর হুসাইন তাতে সাধারণ সৈনিক হিসেবে শরীক ছিলেন। সুতরাং ইয়াযীদও ক্ষমায় শামিল হতে পারে। আল্লাহই ভাল জানেন।

কারবালার শিক্ষা :

কারবালার ইতিহাস থেকে একজন মুমিনের শিখার অনেককিছু আছে। তার মাঝে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় হলো :

১. কুরআন ও সুন্নাহর বিধান যথাযথভাবে চালু করা।

২.মুসলিম ঐক্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে নজর দেওয়া।

৩. ইসলামের মুরব্বিদের সম্মান করা।

৪. সত্যের মোকাবিলায় কোন ব্যক্তির সামনে ভীত না হওয়া।

৫. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় জীবন, সন্তান-সন্ততি এবং ধন-সম্পদ উৎসর্গ করে দেয়া।

৬. ভীষণ মসিবতের সময় পেরেশান না হওয়া। সর্বদা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করা এবং তাঁরই উপর ভরসা রাখা। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা।

হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে, আপনার ও আপনার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এবং সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনদেরকে ভালবাসার ও তাঁদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।